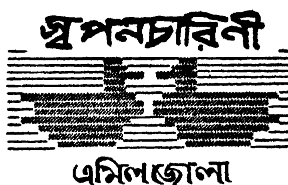
স্বপনচারিণী



এমিল জোলা

অনুবাদক :

রমেন চৌধুরী

ও

বিমান গঙ্গোপাধ্যায়

আর্ট অ্যাণ্ড লেটার্স

পাবলিশার্স

৩৪নং চিত্তরঞ্জন এভিনিউ,

জবাকুসুম হাউস, কলিকাতা-১২।

প্রকাশক :
শ্রীরণজিৎ সেন,
আর্ট এণ্ড লেটার্স পাবলিশার্স,
জবাকুসুম হাউস, কলিকাতা—১২।

প্রথম মুদ্রণ—১৩৬১ চৈত্র

দাম : ৩'টাকা বারো আনা মাত্র

মুদ্রাকর :
শ্রীগিরীন্দ্রশঙ্কর বক্সী,
৫১নং মলঙ্গা লেন, কলিকাতা-১২
পূরবী প্রেস
হইতে মুদ্রিত।

প্রচ্ছদপট এঁকেছেন :
শ্রীঅমূল্য দাস।
প্রচ্ছদপট ছেপেছেন :
মাভানা।

এমিলজোলার স্বপনচারিণী কাহিনীটি একটি সর্ব্বগ্রাসী প্রেমের ভাস্বর লেখনী চিত্র। কেবলমাত্র বিশ্ববিখ্যাত 'নানা'র স্রস্টার লেখনীতেই এমন কাহিনীর জন্ম সম্ভব। জোলা বিশ্বসাহিত্যের অন্যতম শ্রেস্ঠ শৃঙ্গার রস স্রস্টা। তিনি স্বপনচারিণী কাহিনীতে এমনই এক অন্ধ প্রেমের কথা বলেছেন যে প্রেম মানুষের দেহমনের নিষ্ঠুর পাষাণ প্রাকারে শুধু মাথা খুঁটেই মরে। কিন্তু তবু তাকে বাঁধতে পারে তেমন বাঁধন মানুষের নেই।

প্রকাশক।

সূচীপত্র

স্বপনচারিণী

পাহাড়ের ওপরেই সেই ছোট্ট শহরটি গড়ে উঠেছে। পুরোনো কেল্লার ঢিবিটার চরণ-চুম্বন ক'রে নেচে চলেছে পাহাড়ী নদী কলনাদিনী চ্যান্টিক্লেয়ার। নিতল বুকের জলধারা তার অপরূপ স্বচ্ছ, সেই জলে যে কল-ধ্বনি জাগে তারি জন্যে নাম হ'য়েছে ওই। ভার্সাই রোড দিয়ে যদি কেউ আসে, তাহ'লে তাকে শহরের দক্ষিণ তোরণ দিয়ে ঢুকে চ্যান্টিক্লেয়ার পার হ'তে হবে। একটি খিলেন-অলা পাথরের পোল, তার নীচু গোল গোল চওড়া পাঁচিলকে বেঞ্চি হিসেবে ব্যবহার করে শহরতলীর বুড়ো লোকেরা সবাই। উল্টো দিকে বো-সোলেই ষ্ট্রীট শুরু হ'য়েছে, এরই প্রান্তে কোয়াটার ফেম্‌স্ পার্ক পাথর দিয়ে বাঁধানো। ঘন আগাছায় ভরা থাকায় প্রান্তরের মতো শ্যামায়িত মনে হয়। আশপাশের বাড়িগুলি সুষুপ্ত। আধ ঘণ্টা অন্তর পথচারীর টেনে টেনে হাঁটার শব্দ জেগে ওঠে, সে শব্দে রুদ্ধদ্বার আস্তাবলে কুকুর চেঁচামিচি লাগিয়ে দেয়। দৈনিক দু'বার ক'রে পার্কের বুকে চাঞ্চল্য জাগে—সেই সময় সৈনিক অফিসাররা বো-সোলেই ষ্ট্রীটে তাদের কর্মস্থলে যাওয়া আসা করে।

ওই যে বাঁদিকের বাড়িটা—ওটার মালিক হ'চ্ছে একজন মালী। ওখানে থাকে জুলিয়েন মিকন। দোতলায় বড়ো একখানা ঘর ওকে ভাড়া দিয়েছে ওই মালী। সে নিজে তার বাগানের দিকের অংশটা দখল করায় জুলিয়েন এধারে একা পড়ে গেছে। বাড়ির সদর, সিঁড়ি প্রভৃতি একবারে একানে হওয়ায় এই পঁচিশ বছর বয়েসেই সে যেন অল্প আয়ের ক্ষুদে নবাবের মতো বাস ক'রছে সেখানে।

খুব অল্প বয়েসে জুলিয়েন পিতৃমাতৃহীন। খুড়ো মশাই বোর্ডিং স্কুলে পাঠিয়ে দেন, সেখানে কাটে কিছুকাল। শেষে তাঁর লোকান্তরের পর আজ পাঁচ বছর হোলো পোষ্টাপিসে কেরানীগিরি ক'রছে। মাইনে পায় দেড় হাজার ফ্রাঁ; কিন্তু এই পর্যন্তই, আর বাড়বার কোনোই আশা নেই। তাহ'লেও ওরই মাঝে বাঁচিয়ে বাঁচিয়ে চালাচ্ছে, এর চেয়ে সুখের বা স্বাচ্ছন্দ্যের জীবনের কল্পনা তার নেই।

লম্বা, মজবুত, হাড়সর্বস্ব জুলিয়েনের হাত দুটি দীর্ঘ হ'লেও খরচের বেলায় খুবই বিপরীত-ধর্মী। এক কথায় যাকে বলে মিতব্যয়ী। নিজের চেহারার ওপর ওর ধারণা খুবই মন্দ—অত্যন্ত কদাকার বলে মনে করে নিজেকে। চৌকো মাথার গড়ন এমনি উদ্‌ঘুটে যে, মনে হয় কোনো উদাসীন ভাস্কর গড়তে গড়তে মূর্তিটাকে অসম্পূর্ণ অবস্থায় ফেলে রেখেছে। এই অনুভূতি তীব্র হওয়ায় যুবতী মেয়েদের মহলে হাজির হ'তে ও বিশেষ

ভাবে সংকোচ বোধ করে। ফলে সদা সন্ত্রস্ত মনের হাত থেকে অব্যাহতি পাবার জন্যে নীরব একাকীত্ব বরণ ক'রে নিয়েছে। সংগী নেই, সাথী নেই, নেই মন দেয়া-নেয়ার বালাই, বার্ধক্যের জরাজীর্ণ হাতে সঁপে দিয়েছে নিজেকে উদাসীন ব্রহ্মচারীর মতো।

এই নিঃসংগ জীবন তার বোঝা বলে মনে হয় না মোটেই—জুলিয়েন সত্যিই সুখী। নিত্যকার ছক-কাটা জীবন যাত্রার মাঝে শান্তির অভাব ছিলো না। সকালে অফিস গিয়ে আগের দিনের অসমাপ্ত কাজের সমাধানে লেগে যায় শান্ত ভাবে, দুপুরে খাওয়া সেরে আবার কাজ নিয়ে বসে। তার পর বাড়ি ফিরে রাতের খাবার খেয়ে শুয়ে পড়ে। এক ঘুমে পুইয়ে যায় রাত। আবার ওঠে সূর্য, সেই একই তালে ঘোরে জীবনের চাকা।

ছুটির দিনে ভবঘুরের মতো বন্ বন্ ক'রে মাইলের পর মাইল সানন্দে ঘোরাঘুরি ক'রে বেড়িয়ে শেষে শ্রান্ত দেহটাকে টেনে হিঁচড়ে ঘরে এনে তোলে। কেল্লার ঢিবিটার পাশে কতোই তো শ্রীমতিদের ঘোরাঘুরি—একটি দিনের জন্যেও ওখানে জুলিয়েনের উপস্থিতি নেই। অফিসের চটুল মেয়ে কর্মীদের সামনেও ভীষণ বিব্রত হ'য়ে পড়ে, সেই সব মেয়েরা ঠাট্টা তামাসায় ক্ষত বিক্ষত ক'রে ওকে ত্যাগ ক'রেছে। তাদের সন্ধান ব্যর্থ হ'য়েছে বলা চলে!

ওই ঘরখানি দেখছেন—মাথা গোঁজার জায়গা? ওটি

ওর কাছে স্বর্গরাজ্য! পৃথিবীর সংগে সম্পর্ক চুকিয়ে হাজির হয় সেখানে জুলিয়েন, নিজের মনে হাসে, টেনে টেনে নিশ্বাস নেয়, সোজা হ'য়ে দাঁড়ায়। কখনো কখনো আয়নায় নিজের চেহারা দেখে অবাক হ'য়ে যায়—এ কী! সে এখনো এতো তরুণ আছে?

ঘরখানা প্রকাণ্ড। বিরাট খাট, গোল টেবিল, ছু'খানা চেয়ার এবং একখানা আর্মচেয়ারে সাজানো হ'য়েছে ঘরটাকে। জিনিসগুলো রাখার পর অনেকখানি খালি জায়গা র'য়ে গেছে, সেখানে বেশ ঘোরাফেরা করা চলে। বিছানাটি বেশ প্রশস্ত। ছুটি জানলার মাঝে র'য়েছে ছোট একটা ড্রয়ার, ছোটো ছেলেদের খেলনার মতো দেখতে। এখানে বেড়িয়ে, দাঁড়িয়ে একটুও বিরক্তি জাগে না তার। সংগীতে র'য়েছে তার একান্ত অনুরাগ—সারা রাত বাঁশি বাজিয়ে কাটিয়ে দিতে পারে। এর স্থান সকলের ওপরে, এর চেয়ে আমোদের কিছু নেই তার কাছে।

এই বাঁশি বাজানো রপ্ত ক'রেছে জুলিয়েন নিজে নিজেই। বহুদিন আগের কথা, এক খেলনা-অলার দোকানে হলদে রঙের একটা বাঁশি দেখে ভারি লোভ হয় তার। পয়সা কাছে থাকলেও হাস্যাস্পদ হ'বার ভয়ে বাজারে ঢুকে সেটা কিছুতেই কিনে আনতে পারছিলো না। শেষকালে একদিন সন্ধ্যায় সাহস সঞ্চয় ক'রে বাঁশিটা কিনে এক ছুটে পালিয়ে আসে। জানলা দরজা বন্ধ

ক'রে চললো দু'বছর ধরে সাধনা। সহায় একখানি মাত্র পুঁথি, শিক্ষা হোলো বহু পুরোনো গৎ।

মাত্র ছ'মাস ধরে জুলিয়েন জানলা খুলে বাঁশি বাজাতে শুরু ক'রেছে। বিগত শতাব্দীর সহজ সরল মৃদু মধুর সুর-ঝংকার নিজের অক্লান্ত চেষ্টায় যেটুকু অধিকৃত হ'য়েছে তাই-ই গ্রীষ্মের সুপ্তিমগ্ন রাত্রির অন্ধকার ভেদ ক'রে ধ্বনিত হ'য়ে ওঠে। মনে হয় প্রেম রূপ পরিগ্রহ ক'রছে, নীরবতার মাঝে আত্মগোপন ক'রে ছড়িয়ে দিয়েছে তার বাণী—রাতের অন্ধকার ছাড়া এ ভাষা শোনার সম্ভাবনা নেই কোনো সময়েই।

আশপাশের লোকেরা আপত্তি জানাবে বলে ভয় পাচ্ছিলো জুলিয়েন; কিন্তু আপত্তি ক'রবে কে? সারা শহর তো তখন ঘুমের কোলে ঠাঁই নিয়েছে। তা'ছাড়া কোয়াটার ফেম্‌স্ পার্কের বাসিন্দা বলতে তো জনা দুই ভদ্রলোক। একজন হ'চ্ছেন নোটারী এম, স্যাভোর্নিন, অন্যজন অবসর-প্রাপ্ত ফরাসী পুলিশ ক্যাপ্টেন সিদো। প্রতিবেশী হিসেবে এঁরা ভারি সুবিধের, রাত্তির ন'টার মধ্যেই যে যার ঘুমিয়ে পড়েন। অবশ্যি এর চেয়ে বেশি ভাবনার হ'চ্ছে তার জানলার সামনের ওই মার্সানী ভবনের বাসিন্দারা। পাটকিলে রঙের মঠাকৃতি বিরাট বাড়িটি কেমন বিষাদ মাখা। পার্কের উল্টো দিকে এসে শেষ হ'য়েছে তার সীমা-রেখা। সিঁড়ির পাঁচটি ধাপই আগাছায় ভ'রে

গেছে ; সিঁড়ির গোল দরজা, দরজায় অসংখ্য পেরেক মারা। একটা তলাতেই দশ দশটা জানলা। জানলার খড়খড়ি রোজ একই সময় খোলে আবার বন্ধ হয়, কিন্তু ভারি পর্দা ঝোলানো থাকায় ভেতরের কোনোকিছু দেখার সুবিধে নেই। বাঁদিকে প্রকাণ্ড বাদাম গাছগুলি বাগানের শ্যামলতাকে কেল্লার ঢিবি পর্যন্ত প্রসারিত ক'রেছে।

সারা পল্লী-অঞ্চলে এই প্রাসাদটির যথেষ্ট নাম-ডাক আছে ; একে দর্শন ক'রতে নানা আগন্তুকের সমাগম হোতো বলে শোনা যায়। মার্সানী-বংশের ধন-দৌলতের কিংবদন্তীর অস্তিত্বও র'য়েছে, জুলিয়েন কতোই না চেষ্টা ক'রছে, দিনরাত বসে থেকেছে জানলায় যদি একটুখানি দেখতে পায় কিছু। সবি হ'য়েছে নিষ্ফল। পাটকিলে রঙের বাড়ির সামনের শোভা আর বাদাম গাছের ছায়াই ধরা দিয়েছে তার চোখে। ওই সিঁড়ি ভাঙতে না দেখা গেছে কাউকে, না খুলেছে শ্যাওলা-ধরা বিরাট দরজার পাল্লা দুটি। মার্সানীরা এই দরজা দিয়ে যাওয়া-আসা বন্ধ ক'রে দিয়েছে আজকাল, সেণ্ট অ্যানি ষ্ট্রীটের লোহার ফটক দিয়ে যাতায়াত ক'রে থাকে। কেল্লার ঢিবির কাছে সরু একটা গলির শেষে ছোট্ট ফটক র'য়েছে বাগানে যাওয়ার—সেটা জুলিয়েনের দেখতে পাওয়ার উপায় নেই। রূপকথার রাজপুরীর মতো অদৃশ্য মানুষে ভরা এই বাড়িটিকে প্রাণহীন বলে মনে হয় জুলিয়েনের।

সেদিন ছিলো রবিবার। গির্জার সামনের পার্কে পোষ্টাপিসের একটি সহকর্মী একজন দীর্ঘাকৃতি বৃদ্ধ ও একটি বৃদ্ধাকে দেখিয়ে জুলিয়েনকে জানায় ওঁরাই হ'চ্ছেন মার্কুইস দম্পতি। ওঁদের একমাত্র মেয়ে মাদমোয়াজেল থেরেসা দ্য মার্সানী এখনো কনভেণ্টে আছে। সেই যে এম স্যাভোর্নিনের কেরানী ক্ষুদে কলম্বেল, সে হ'চ্ছে থেরেসার ভাই।

সেণ্ট অ্যানি ষ্ট্রীটের ভেতরে বৃদ্ধ দম্পতি ঢুকতে যাবেন, ক্ষুদে কলম্বেল এসে হাজির হয়। মার্কুইস ভদ্রলোক হাত বাড়িয়ে বিশেষ অনুগ্রহে সম্মানিত করেন তাকে। এ ভাবে কাউকেই সম্মান জানান না তিনি। জুলিয়েন বঞ্চিত হোলো এহেন সৌভাগ্যে। বিশ বছরের ছেলে কলম্বেলের সংগে জুলিয়েনের দা-কুড়ুল সম্পর্ক। এর কারণ হ'চ্ছে কলম্বেল জুলিয়েনের ভীরুতার সুযোগ নিয়ে নানা ঠাট্টা তামাসা ক'রতো, এমনকি বো সোলেই ষ্ট্রীটের ধোপানীদের পর্যন্ত ক্ষেপিয়ে দিয়েছিলো। ফলে একদিন সন্ধ্যায় দুজনের সে কী ঘুঁষোঘুঁষি! চোখের কোলে কালশিরে নিয়ে রণে ভঙ্গ দিলো নোটারীর কেরানীটি।

জুলিয়েন কোয়াটার ফেম্‌স্ পার্কের এই বাড়িতে পাঁচ বছর ধরে বাস ক'রছে। কিন্তু জুলাই মাসের এক সন্ধ্যায় ঘটলো একটা ব্যাপার। দীর্ঘ দিনের শান্ত সমাহিত জীবন সহসা চঞ্চল হ'য়ে উঠলো। সে রাতে গরম পড়েছিলো

অসম্ভব রকম, ঘর অন্ধকার, অন্যমনস্ক হ'য়ে বাঁশি বাজিয়ে চলেছে জুলিয়েন। হঠাৎ সামনের ওই মার্সানী ভবনের জানলা খুলে গেল ফট্ ফট্ ক'রে। চমৎকার আলোক-রশ্মি বিচ্ছুরিত হ'তে থাকে, তারি মাঝ দিয়ে জেগে ওঠে একটি অতি অল্প বয়সী মেয়ের মুখ—জানলার গরাদের উপর ঝুঁকে পড়ে শুনছে বলে মনে হয়। জুলিয়েনের সারা শরীরে শিহরণ—মুহূর্তে বাঁশি থামিয়ে ফ্যালে। মেয়েটির মুখ ভালো ক'রে দেখতে পায়না, চোখে পড়ে শুধু খোলা চুলের রাশি। কানে আসে সেই নীরবতার বুক বেয়ে মৃদু কণ্ঠস্বর : শুনতে পাচ্ছিস না ফ্রাঙ্কোয়ে—মনে হ'চ্ছে সুরের ঝংকার, অবিকল!

ঘরের ভেতর থেকে কর্কশ গলায় কে যেন বলে : ও বুলবুলি গাইচে, খুকি! নাও জানলা বন্ধ করো, দ্যাখো কোনো পোকা মাকড় ঢুকলো কিনা এই রাত বিরেতে!

অন্ধকার হ'য়ে গেল আবার, জুলিয়েন তার চেয়ার ছেড়ে উঠতে পারে না। সেই ভাবে অতিবাহিত হয় আরো একটি ঘণ্টা। মৃদু সুরের কাঁপন তোলে বাঁশিতে এবং ধীরে ধীরে। মেয়েটা নিশ্চয়ই ভেবে নিয়েছে বাদাম গাছে কোনো বুলবুলি গান গাইছে! এ কথা মনে হ'তেই জুলিয়েনের মুখে হাসির রঙ ধরে।

পরের দিন। পোষ্টাপিসে গুঞ্জন ওঠে—মাদমোয়াজেল থেরেসা দ্য মার্সানী কনভেন্ট ছেড়ে দিয়েছে। জুলিয়েন চুপ ক'রে থাকে, সে যে তার উন্মুক্ত গলা, তার

এলোমেলো চুলের ভার দেখতে পেয়েছে সে কথা জানায় না। এ মেয়েটি এতোদিনকার বাঁধা-ধরা জীবনে তার একটা বিপর্যয় এনে দিতে বসেছে—যতো মনে হয় ততোই অবর্ণনীয় অনুভূতির ছোঁয়া পায় সে। এর পর থেকে কী ক'রে বাজাবে বাঁশি? গান-বাজনা জানা তরুণীদের কানে তার কাঁচা সুর নিশ্চয়ই অত্যন্ত খারাপ শোনাবে!

সে রাতে জুলিয়েন ঘরে ফিরলো চুপি চুপি। আলো জ্বাললো না। সামনের সেই জানলা আজ আর খুললো না। রাত তখন দশটা হবে, একটা ম্লান আলোর রেখা উজ্জ্বল হ'য়ে উঠলো ওপারের জানলার খড়খড়ির ফাঁকে, খানিক বাদে আবার অন্ধকার! জুলিয়েন বসে বসে ওই অন্ধকার জানলার কথাই ভাবে।

এর পর থেকে প্রত্যহ সন্ধ্যেবেলায় কাজ হোলো তার লুকিয়ে লুকিয়ে এমন ধারা লক্ষ্য করা। কোনো পরিবর্তনের আভাস পাওয়া যায় না, আগের মতোই পুরোনো প্রাসাদটি ঘুমোতে থাকে। নতুন জীবনের সাড়া পেতে হ'লে চোখ কানকে যথেষ্ট তৈরী করা দরকার! কখনো কখনো জানলায় আলোক রশ্মি ঘুরে বেড়ায়, পর্দার কোণ খানিকটা উঠে যায়, সেই উন্মুক্ত পথে প্রকাণ্ড ঘরখানা চকিতের মতো নজরে পড়ে। অন্য সময়ে মৃদু পদসঞ্চারে বাগানে কে যেন যাচ্ছে মনে হয়, পিয়ানো বাজিয়ে কে যেন গাইছে ক্ষীণ ভাবে, ভেসে আসে তারি সুর। এইটুকু শব্দেই জুলিয়েন রেগে ওঠার ভান ক'রে ঢাকা দিতে চায় তার কৌতূহল।

থেরেসা তার চোখের সামনে আর একটিবার মূর্ত হ'য়ে উঠুক—হ্যাঁ আর একটিবার। স্বীকার না করলেও এই-ই ছিলো জুলিয়েনের আন্তরিক কামনা। কল্পনায় প্রত্যক্ষ করে সুদর্শনা মেয়েটির গোলাপী দুটি গাল, উজ্জ্বল চোখ; কিন্তু দিনমানে জানলায় দাঁড়াবার সাহস হয় না। রাতের অন্ধকারে ছায়ামূর্তির মতোই শুধু যা দেখেছে।

একদিন সকাল বেলা; জানলা দিয়ে রোদ এসে পড়েছে ঘরে, জুলিয়েন রোদের হাত থেকে আত্মরক্ষার জন্যে আসে জানলাটা বন্ধ ক'রে দিতে। ও কে? হ্যাঁ, ওই যে ঘরের মাঝখানেতে দাঁড়িয়ে? এই তাহ'লে থেরেসা? সুন্দর সাধারণ গড়ন, বেশ লম্বা আর ফ্যাকাসে, মনে হ'চ্ছে ঝলমল করছে সে। মেয়েটির সম্বন্ধে তার প্রায় আশঙ্কাই ছিলো—দেখা গেল কল্পনার রঙে গড়া মানস-প্রতিমার সংগে বাস্তবের মানুষের অনেকখানি প্রভেদ। লাল টক্‌ট'কে মুখখানি এর যথেষ্ট বড়ো, কালো চোখ দুটি দ্যুতিহীন। হাবভাবে মনে হয় হৃদয়হীনা কোনো রাজমহিষী! ধীর পায়ে জানলার সামনে এসে দাঁড়ায়, আবার ফিরে যায়। না না, জুলিয়েনকে দেখতে সে মোটেই আসেনি। যে ভাবে ঘাড় ঘুরিয়ে ছন্দিত ভঙ্গিতে ফিরে গেল, জুলিয়েন অসহায় বোধ করে। সুস্থ সবল বলিষ্ঠ পুরুষ জুলিয়েন এই নারীর কাছে শিশু ছাড়া আর কিছুই নয়।

এর পরের ঘটনা দুর্বিষহ! কতো কাছেই তো কল্পনার

রাণী তার রূপের ছটায় আলোকিত ক'রে অবস্থান ক'রছে, তবু কতোই না দূর! কিন্তু সে জুলিয়েনের অস্তিত্ব পর্যন্ত স্বীকার করে না। জানলায় এসে দাঁড়িয়ে দূরের জনবিরল পার্কের দিকে তাকিয়ে থাকে তবু প্রতীক্ষারত এই মানুষটিকে ফিরে দ্যাখেনা।

গ্রীষ্মের রাত্তিরে জুলিয়েন বাঁশি বাজানো শুরু ক'রলো আবার—মান্ধাতার আমলের সুর খোলা জানলা দিয়ে ছড়িয়ে যায়। কৃষ্ণপক্ষের রাতেই সুর-সাধনা নির্দিষ্ট হোয়েছে এবার। চারিদিক অন্ধকারে ঢাকা, তারি মাঝ দিয়ে রাতের পাখির মৃদু পক্ষ সঞ্চালনের মতো মধুর সুর-ঝংকার নিদ্রিত পুরীকে আঘাত ক'রে ফেরে। শ্বেত বসনে আবৃত হ'য়ে থেরেসা জানলায় এসে দাঁড়াক—এমন আবেগ পোষণ ক'রেছে জুলিয়েন প্রথম রাত্রে।

কনুয়ে ভর দিয়ে অবাক হ'য়ে সেই প্রথম শোনা সুরের পুনরাবির্ভাবে উৎফুল্ল হ'য়ে ঘরের ভেতরে খুব জোরে থেরেসা বলে ওঠে: শোন্ ফ্রাঙ্কোয়ে, এটা পাখির গান নয়!

ভেতরে বৃদ্ধাটির ছায়া দেখতে পায় জুলিয়েন: তা হবে কতো দূর থেকে আসছে শব্দ; না জানি কে বাজাচ্ছে খুশি মতো।

খানিক চুপ ক'রে থেকে মেয়েটি বলে ওঠে: হ্যাঁ, দূরেই বোধ হ'চ্চে!

উচ্চগ্রামে বাঁশি-সাধা চললো প্রতি রাত্রে এর পর

থেকে। বাদকের যা কিছু কামনা বাসনা এই হলুদ কাঠের বাঁশিটি সুরে সুরে ব্যক্ত ক'রে, এ-বাড়ি ও-বাড়ির ছাতে অলিন্দে প্রতিহত হ'য়ে ফেরে, থেরেসা উন্মুখ হ'য়ে শোনে। একদিন সুর-ঝংকার খুব সন্নিকট মনে হ'তে লাগলো থেরেসার; ভাবে পার্কের ধারের কোনো পুরোনো বাড়িই বুঝি এ সুরের উৎপত্তি স্থান। জুলিয়েনের বিশ্বাস দৃঢ় হয়, এই অন্ধকারের মাঝে সুরের সহায়তায় তার ধ্যানের লক্ষ্মীকে নিশ্চয়ই আকর্ষণ ক'রে আনতে পারবে। দেখা যায় সে ধারণা মিথ্যা নয়; থেরেসা ঝুঁকে পড়েছে—সে আকৃষ্ট হ'য়েছে, হ'য়েছে পরাভূত!...

সেই বৃদ্ধার কণ্ঠ শোনা যায়ঃ ওরে, আজকে ঝড় বাদলের রাত আর ওখানে থাকিস নি। শেষে ঘুমের ঘোরে চেঁচিয়ে উঠবি!

জুলিয়েনের ঘুম আসে না সে রাতে। থেরেসা নিশ্চয়ই অনুমান ক'রেছে তাকে বাঁশি বাজিয়ে ব'লে, হয়তো দেখেছেও। তাহোক, তবু সে ওর সামনে বেরুবে না।

পরের দিন ভোর ছ'টা আন্দাজ; জুলিয়েন খোলা জানলার সামনে দাঁড়িয়ে বাঁশিটাকে বাক্সে তুলে রাখছে, হঠাৎ থেরেসার জানলার খড়খড়ি ধড়াস্ ক'রে খুলে গেল। যে মেয়ে বেলা আটটার আগে কোনোদিন ঘুম থেকে ওঠে না এতো সকালে গরাদের ওপর ঝুঁকে এসে দাঁড়ালো। ওর মুখের দিকে তাকিয়ে নড়বার শক্তি হারিয়ে ফ্যালে জুলিয়েন।

থেরেসাও তন্ন তন্ন ক'রে খুঁটিয়ে দেখতে থাকে এই ভীরু শক্ত সবল মানুষটিকে। একসময় তার বিদ্‌ঘুটে চেহারা দেখা শেষ হোলো মেয়েটির। গত রাত্রে আনন্দে অধীর ক'রে তুলেছিলো তাকে যে মানুষটি সে কি নিতান্তই অবহেলার? এমনই একটা প্রশ্নের মীমাংসা ক'রতেই থেরেসার আগমন এতো ভোর বেলায়। সে সন্দেহ ভঞ্জন ক'রে দৃপ্ত ভঙ্গিতে পেছন ফিরে দড়াম্ করে জানলাটা ভেজিয়ে দেয়।

অবসাদে পা ভেঙে আসে, জুলিয়েন ধপাস্ করে আর্ম চেয়ারে বসে পড়ে। ভগ্নস্বরে বলে ওঠেঃ হায় হায়, আর আমি বাঁচবো না! আমি যে ওকে ভালোবেসেছি, কিন্তু আমার এই চেহারা তো ও সহ্য ক'রতে পারবে না!

ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে সে। কেন মরতে সামনে বেরিয়েছিলো। মেয়েদের মনে আঘাত দেবার কী অধিকার আছে তার? শত ধিক্কারে ধিক্কৃত করে জুলিয়েন নিজেকে।

• সেই থেকে বাঁশির সুর শুনতে থেরেসাকে আর ঝুঁকে দাঁড়াতে দেখা যায় না একেবারেই। ঘরে আসে যায়, জানলায় দাঁড়ায়, গ্রাহ্য করে না সামনের লোকটির উপস্থিতি। সে যে সুরে সুরে প্রেম নিবেদন ক'রতে চায় সে সম্বন্ধে থেরেসার দৃক্‌পাত নেই। একদিন তো চেঁচিয়ে বলেই ওঠে: কী জ্বালাতন! বেসুরো সুর শুনে শুনে কান ঝালাপালা হ'য়ে গেল!

ক্ষোভে হতাশায় জুলিয়েন ছুঁড়ে ফেলে দেয় বাঁশিটা। সেদিনের সুরের সাধনার সেখানেই ইতি।

ক্ষুদে কলম্বেল পর্যন্ত ঠাট্টা ক'রে যেতে থাকে। অফিস যাওয়ার সময় একদিন জুলিয়েনকে জানলায় বসে বাঁশি বাজাতে দেখে সে বিশ্রীভাবে হেসে উঠলো! তার সেই হীন ঘৃণা হাসি! জুলিয়েনের বুকের মধ্যে মোচড় দিয়ে ওঠে—এই ছোঁড়াটাও ওই মার্সানী ভবনে যাবার অধিকারী! এটা কিন্তু হিংসে নয়, অক্ষমতার অনু-শোচনা! ওর জীবন যদি এক ঘণ্টার জন্যেও পাওয়া যেত।

কলম্বেলের মা ওই ফ্রাস্কোয়ে মার্সানী-ভবনে বহুকাল ধরে রয়েছে। ও এ-বাড়ির লোকেদেরই একজন হ'য়ে পড়েছে। উপস্থিত থেরেসার দেখাশোনা করে। ছোটো-বেলায় চাষীর ছেলে কলম্বের আর এই অভিজাত তরুণী একসংগে খেলা-ধূলা ক'রেছে কাজেই অতীতের বন্ধুত্বের কিছুটা রেশ যে এখনো জেগে থাকবে এদের মনে, এটা তো স্বাভাবিক। পথে ঘাটে যখন কলম্বেলকে দেখতে পায় জুলিয়েন, দ্যাখে হতভাগাটার মুখে সেই রকম হাসি! এ কী কম যাতনার? এ জ্বালা আরো বাড়ে যখন আবিষ্কার করে পাজীটা দেখতে নেহাৎ মন্দ নয়! কেমন বেড়ালের মতো গোল মাথা, ছিপ্ছিপে সুন্দর গড়ন শয়তানী মাখানো। চোখ দুটো সবুজ, নরম গালে কোঁক্ড়ান দাড়ির সামান্য আভাস পাওয়া যাচ্ছে।

মনের সংগে মারাত্মক রকম সংগ্রামের পর জুলিয়েন তার প্রেমের স্বপ্নকে ত্যাগ ক'রতে সমর্থ হোলো। হতকুশ্রী চেহারাকে চোখের আড়াল ক'রে রাখবার জন্যে কয়েক সপ্তাহ গা ঢাকা দিয়ে রইলো। শেষে লজ্জা তার রাগে রূপায়িত হয়। না, আর নয়, কামনা-দগ্ধ মুখ, দীর্ঘ অঙ্গপ্রত্যঙ্গ তাকে এবার সে দেখাবেই। আর করেও তাই, জানলায় দাঁড়িয়ে থাকে ঠায়। মরীয়া লোকেদের মতো নৃশংস আচরণ ক'রতে তার বাধে না, তরুণীটির উদ্দেশে দু দু'বার অনুরাগ-চুম্বন পর্যন্ত পাঠিয়ে দেয়। থেরেসা এতে রাগ করে না, জুলিয়েন তার চোখের আড়ালে থাকতেও যেমন মহিমময়ীর মতো ঘুরে বেড়াত এখনও সেই রকম দৃঢ় পদক্ষেপে যাওয়া-আসা করে। বরং সে অভিব্যক্তিতে কিছুটা শীতলতা, সামান্য ঔদ্ধত্য মিশ্রিত হ'য়েছে।

প্রথম বছরের দিনগুলি একের পর এক কেটে যায় সমান তালে। শুরু হোলো গ্রীষ্মের উত্তপ্ত উপস্থিতি.

কেমন যেন নতুনত্বের গন্ধ পায় জুলিয়েন। ছোটো খাটো ঘটনা একই ভাবে হ'চ্ছে—জানলা তেমনি সকালে খোলে রাত্তিরে বন্ধ হয়, আগের মতো সময়েই থেরেসা এসে দাঁড়ায় সেখানে। কিন্তু তারি মাঝে নতুন লাগে ঘরটিকে। থেরেসা আগের চেয়ে বেশ খানিকটা ঢ্যাঙা হ'য়েছে, রঙ্‌টা আরো ফ্যাকাসে বলে মনে হয়। আর

একদিন চরম উত্তেজনার মাথায় জুলিয়েন চুম্বন জানায় থেরেসাকে। এবার নিয়ে তিনবার ঘটলো এই ব্যাপার। অপলকে চেয়ে রইলো থেরেসার দিকে কেমন অশান্ত হাবভাব তার। মুখ রাঙা ক'রে জুলিয়েন তাড়াতাড়ি সরে যায়।

গ্রীষ্মের শেষাশেষি সামান্য একটা ঘটনায় সব ওলট পালট হ'য়ে গেল জুলিয়েনের। সন্ধ্যের ঠিক আগটায় সামনের বাড়ির জানলাটা ভীষণ শব্দে বন্ধ হ'য়ে যায়—এ হোলো প্রায় প্রত্যহের ঘটনা। জুলিয়েন ভয়ানক চমকে ওঠে, কিছুতেই ধরতে পারে না এটা কে করে! একদিন সন্ধ্যেয় দেখলো থেরেসা ফ্যাকাসে হাতে জানলাটা টেনে দিচ্ছে প্রচণ্ড ভাবে। ঘণ্টা খানেক পরে জানলা আবার খুলে দেয় সে নিজের হাতেই—এবারে ব্যস্ততার চিহ্ন-মাত্র নেই, অতি ধীর মন্থর গতি, মুখে চিন্তার ছায়া।

শরতের সন্ধ্যাটি সেদিন ভারি রমনীয় হ'য়ে উঠেছে; তীব্র শব্দ শোনা যায়, জানলা খোলার এ হোলো প্রস্তুতি-পর্ব। জুলিয়েন শিউরে উঠলো, চোখে জল এসে গেল তার। প্রতীক্ষার সমাপ্তি ঘটিয়ে মুহূর্তের মধ্যেই তেমনি সশব্দে জানলা খুলে দাঁড়ালো এসে থেরেসা। খুব সাদা মনে হ'চ্ছে তাকে, চোখ বিস্ফারিত চুলগুলো লুটিয়ে পড়েছে কাঁধের ওপর। দুহাত ঠোঁটের ওপর রেখে চুম্বন জানায় জুলিয়েনকে।

পাগল হ'য়ে ওঠে জুলিয়েন। বুকের ওপর হাত রেখে

জানতে চায়—এটা কি তার জন্যেই? ভয়ে পিছিয়ে যাচ্ছে মনে ক'রে থেরেসা সামনে ঝুঁকে প'ড়ে পর পর দু'বার চুম্বন করলো। জুলিয়েন হতবাক, নড়বার ক্ষমতা পর্যন্ত হারিয়ে ফেলেছে!...

ওকে জয় করা সম্ভব হ'য়েছে বুঝে সামনের পার্কের দিকে ইশারা ক'রে চাপা গলায় থেরেসা বললো একটি মাত্র কথা: এসো!

চঞ্চল-পায়ে নেমে গেল জুলিয়েন, হাজির হোলো বাড়ির সামনে। মাথা তুলতেই চোখে পড়লো সেই সিঁড়ির ওপরকার মরচে-পড়া শ্যাওলা-ঢাকা দরজাটা খানিক ফাঁক হ'য়ে গেছে। কোনো বিস্ময়ই অপেক্ষা ক'রে নেই, আচ্ছন্নের মতো উঠে এসে ঢুকলো ভেতরে। সংগে সংগে দরজা বন্ধ হ'য়ে গেল। একখানা হিম-শীতল হাত তাকে ধরে নিয়ে চললো ওপরে। সামনে বারান্দা, তারপর ঘর...এগিয়ে চলে সে। শেষে দেখা দিলো সেই অতি-পরিচিত ঘরখানা, তার স্বপ্নের নন্দন-কানন। ওই তো গোলাপী সিল্কের পর্দাগুলি হাওয়ায় উড়ছে। পা ভেঙে আসতে চায়, দ্যাখে থেরেসা মাথা উঁচু ক'রে দাঁড়িয়ে আছে তারি সামনে। কিসের গভীর চাঞ্চল্য প্রশমিত ক'রতে হাত দুটি শক্ত ক'রে চেপে আছে যেন।

অতি মৃদু স্বরে উচ্চারিত হোলো: আমায় ভালোবাসো তুমি?

জড়িত কণ্ঠে জুলিয়েন বলে: নিশ্চয়! হ্যাঁ হ্যাঁ, সত্যি বলচি!

এ নিশ্চয়ই বাজে কথা, সেটা অনুমান ক'রে থেরেসা অঙ্গভঙ্গি করে। তারপর উদ্ধত হ'য়ে স্পষ্টভাবে বলে: আমাকে যদি পাও, পারবে আমার জন্যে যে কোনো কাজ ক'রতে? কী, পারবে না?

কথা ফোটেনা মুখে, হাত মুঠো ক'রে ধরে নিজেরই। চুম্বন—একটি মাত্র চুম্বনের জন্যে নিজেকে বিকিয়ে দিতে পারে সে।

—শোনো, তোমার মতো আমারও একটা উদ্দেশ্য আছে। এসো লাভের বখরার জন্যে আমরা প্রতিজ্ঞা করি। আমার করণীয় আমি ক'রবো প্রতিজ্ঞা ক'রলুম, এখন তুমি শপথ করো—তাড়াতাড়ি......

'তুমি যা বলবে তা-ই ক'রবো, প্রতিজ্ঞা করচি'—বেশ চেঁচিয়েই বললো জুলিয়েন।

ঘরের সুরভিত আবহাওয়ায় নেশা ধরে যায় তার। বিছানার পর্দাটা সরিয়ে ফেলা হোলো। গোলাপী সিল্কের ছায়াঢাকা বিছানাটি পবিত্র উত্তেজনায় তার মন ভরিয়ে তোলে।

পাশবিক ভঙ্গিতে পর্দাটা ছিঁড়ে থেরেসা ছুঁড়ে দিলো। সন্ধ্যার ক্ষীণ-আলো এসে পড়ে বিছানার ওপর। সব যেন লণ্ডভণ্ড হ'য়ে আছে, চাদর সরে গেছে, বালিশ একটা

পড়ে আছে মেঝেতে ; দাঁতে ক'রে কেউ সেটাকে ছিঁড়ে রেখেছে মনে হয়। স্তূপীকৃত বিছানা-পত্তরের ওপর কোণাকুণি ভাবে পড়ে র'য়েছে একটা লোক।

'ওই—ও হোলো আমার প্রেমাস্পদ—চাপা গলায় থেরেসা বলে : ওকে আমি ধাক্কা দিয়েছিলুম, ধাক্কা খেয়ে পড়ে যায়। তারপরের কথা জানি না। হ্যাঁ, ও বেঁচে নেই। তোমায় ক'রতে হবে কি জানো? সরিয়ে ফেলতে হবে ওই দেহ। এছাড়া আর কিছু নয়! বুঝেছো? হ্যাঁ হ্যাঁ, শুধু এই।

কলম্বেল থেরেসার চেয়ে প্রায় মাস ছয়েকের বড়ো। খুব ছোটোবেলা থেকেই সে থেরেসার ফাইফরমাস খাটছে। ওর মা ফ্রাঙ্কোয়ে ওকে এক রকম টেনে নিয়ে এসেছিলো প্রভু-কন্যার দেখাশোনা করার জন্যে।

থেরেসার প্রকৃতি ছিলো সাংঘাতিক রকম দুর্দান্ত—এককথায় সে একটি গেছো মেয়ে। লোকের সামনে কতোই যেন নিরীহ ধরন-ধারণ, কী ভব্য-সভ্য। যেই কেউ থাকেনা, স্বমূর্তি প্রকট হ'য়ে ওঠে তার। চীৎকার করে জিনিসপত্তর ভেঙেচুরে ফেলে একসা করে। কখন যে সে কি ভাবছে, কারুর ধারণা করার সাধ্যি নেই। ওই স্বচ্ছ চোখদুটিতে কখন কিসের ছায়া পড়ে চেষ্টা ক'রেও কেউ হদিস পায় না।

ছ'বছর বয়েস থেকেই কলম্বেলকে পীড়ন ক'রতে শুরু ক'রেছে। ছোটোখাটো পাৎলা গড়নের এই ছেলেটিকে

বাগানের প্রান্তে টেনে নিয়ে গিয়ে তাকে ঘোড়া বানিয়ে লাফিয়ে কাঁধে উঠে পড়ে। ওকে ব'য়ে ব'য়ে মাথা ঘুরে পড়ে যাবার মতো হ'লে তার কানে মোক্ষম কামড় বসিয়ে দেয়, আঁচড়ে খাম্‌চে গায়ের মাংস তুলে নেয়। বাপ-মার সামনে ও কলম্বেলকে মার-ধোর করে, যন্ত্রণায় সে যদি কেঁদে ওঠে তা'হলে রাস্তায় বার ক'রে দেবে বলে ভয় দেখায়। এইভাবে দুজনের মধ্যে একটা গোপন সম্পর্ক গড়ে ওঠে। খেলনাকে যেমন মাঝে মাঝে ভেঙে গুঁড়িয়ে ফেলতে ছেলেপিলেদের ভীষণ ইচ্ছে করে—কলম্বেলকে একা পেলে থেরেসারও তেমন সাধ জাগে। ওকে জয় করার, ওর ওপর কর্তৃত্ব করার বাসনা তাকে তখনই পেয়ে বসে, যখন আশেপাশে কেউ কোথাও থাকে না।

কলম্বেলের প্রতিঘাত দেবার স্পৃহা মাঝে মাঝে তীব্র হ'লেও নীরবে সবকিছু সহ্য করে। ভারি চালাক ছেলেটা। সে-ও ছেড়ে কথা কয় না, যখন তাকে ধাক্কা দিয়ে মাটিতে ফেলে দেয়, থেরেসাকে সে সংগে সংগে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে গড়িয়ে প'ড়ে। ফলে তারও গা ছ'ড়ে যায়। কলম্বেল এভাবে উৎপীড়িত হ'লেও কক্ষণো চেঁচায় না বা কাঁদে না। এ ব্যাপার তাদের নিজেদের একান্তভাবে, এতে আর কেউ মাথা গলায় তা যেন সে চায় না।

মার্কুইস ভদ্রলোক মেয়েকে এমন উদ্ধত-প্রকৃতির হ'তে

দেখে বিশেষ চিন্তিত হ'য়ে পড়েন। শেষে ঠিক করেন কোনো কনভেণ্টে পাঠাবেন—সেখানকার কঠিন রীতিনীতিতে অভ্যস্ত হ'লে থেরেসার নিশ্চয়ই মতিগতির পরিবর্তন হবে। সেই উদ্দেশ্যেই থেরেসা এতোদিন কনভেণ্টে থেকে কয়েক দিন হোলো বাড়ি ফিরেছে। ওর বয়েস এখন আঠারো বছর।

ওঁদের ধারণা মিথ্যে হয়নি দেখা গেল—থেরেসা যথেষ্ট ভব্য হ'য়েছে সেই সংগে হ'য়েছে অসম্ভব রকম লম্বা, মা বাবা নিশ্চিন্ত হ'লেন। পনেরো বছর ধরে মার্কুইস-দম্পতি নিঃসঙ্গ জীবন যাপন ক'রছিলেন; আবার ড্রয়িংরুম খুলে দিলেন। বন্যাস্রোতে অতিথি-অভ্যাগতের দল এসে হাজির হ'তে লাগলো। শুরু হোলো প্রতিদিন খানাপিনা, নাচ-গান। এবার মেয়ের বিয়ের ব্যবস্থা করা দরকার, কাজেই পাণি-প্রার্থীদেরও দেখা যায় মার্সানী-ভবনে। থেরেসাকে কেমন যেন পাণ্ডুর লাগে, উৎসাহী প্রার্থীর দল তাঁর চটকে আকৃষ্ট হ'য়েও কেমন যেন ভরসা পায় না।

এর মধ্যে থেরেসা, কলম্বেলের নাম কিন্তু একদিনও করেনি। মার্কুইস কলম্বেলকে ইস্কুলে পড়িয়ে শুনিয়ে এম, স্যাভোনিনের অফিসে কাজে ঢুকিয়ে দিয়েছিলেন। একদিন ফ্রাঙ্কোয়ে থেরেসার কাছে তার ছোটোবেলার সাথীকে এনে হাজির ক'রলো। কলম্বেল এখন বেশ হাসিখুশি, শান্ত-প্রকৃতির হ'য়েছে, হ'য়েছে যথেষ্ট সপ্রতিভ। থেরেসা তাকে চিনতে পারে, কিন্তু পাত্তা দেয় না।

কিন্তু এক সপ্তাহ যেতে না যেতে কলম্বেল আবার এলো—অতীতের কাজকর্মের বোঝা তুলে নিলো কাঁধে। সেই থেকে সন্ধ্যায় গানের বই ইত্যাদি নিয়ে আসে, এটা ওটা করে, চাকরের ফাইফরমাস খাটে। ছোটোবেলায় যেমন তারা দুজনে একা একা ঘুরতো, খেলতো, দরজা বন্ধ ক'রে ঘরে থাকতো, সেইভাবে থাকবার সুযোগ পেল। এটা কেউ-ই দোষের মনে ক'রলো না।

ছেলেবেলার খেলাধূলো বদল হ'তে দেখা যায় এখন। এখন থেরেসা গাউন লুটিয়ে ঘাসের ওপর দিয়ে ধীরপায়ে বেড়িয়ে বেড়ায়, কলম্বেল ধনী যুবকের মত সেজেগুজে ছড়ি হাতে সংগে সংগে যায়, ছড়ি দিয়ে পথের দু'ধারে আঘাত করে। কিন্তু তবু অতীত দিনের মতোই প্রভেদ র'য়েচে, একজন রাণী, অপরটি তার বান্দা! আগের মতোই অত্যাচার করে থেরেসা, কখনো কোমল কখনো কর্কশ ব্যবহার—অন্ত পাওয়া যায় না।

সেদিন গ্রীষ্মের সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছে—বাদাম গাছের তলায় ঘনায়মান অন্ধকারের মাঝ দিয়ে বেড়াচ্ছে তারা দু'জনে। সহসা নীরবতা ভেঙে থেরেসা বলে ওঠে ঃ কলম্বেল, আর পারছি না, বড্ড ক্লান্ত আমি! মনে করো সেই আগেকার মতো আমায় পিঠে ক'রে নিয়ে যাচ্চো।—

হাল্কা হাসি ভেসে ওঠে ঠোঁটের কোণে, কলম্বেল গম্ভীর ভাবে বলে, বেশ তো থেরেসা, আমি রাজী আছি।

আর কথাটি না বলে থেরেসা লাফিয়ে কলম্বেলের পিঠের ওপর উঠে পড়লো। চেঁচিয়ে বললে : চলো এবার।—

ওর হাত থেকে ছড়িটা ছিনিয়ে নিয়ে তাই দিয়ে সপাং ক'রে দিলো ঘা কতোক পায়ের ওপর। থেরেসা মাংসল উরুতের চাপে ওকে বাধ্য ক'রলো সেই ছায়াভরা গাছতলা দিয়ে ছুটতে। কোনো কথা কয় না কলম্বেল, ঘন ঘন নিশ্বাস পড়তে থাকে। পাছে সে ওই উষ্ণ উরুতের চাপে মাটিতে হুমড়ি খেয়ে পড়ে, তাই যথাসম্ভব শক্তিতে পা দুটোকে শক্ত ক'রবার চেষ্টা করে।

'হ'য়েচে হ'য়েচে, আর নয়'—চেঁচিয়ে ওঠে থেরেসা।

কে কার কথা শোনে, কলম্বেল তেম্নি ছুটতে থাকে। থেরেসা এবার আঁচড়ে কামড়ে ক্ষতবিক্ষত ক'রে তোলে কলম্বেলকে। সে সোজা মালীর যন্ত্রপাতির ঘরে ছুঁড়ে ফেলে দেয় থেরেসাকে। প্রতিহিংসায় শরীরে শক্তি বাড়িয়ে নেয়, অনায়াসে পরাজিত করে চিরদিনকার বিজয়িনী নারীকে! এবার কর্তৃত্ব করার পালা একান্তভাবে তার।......

থেরেসা ক্রমেই পাণ্ডুর হ'তে থাকে, কালো চোখ আরো কালো হয়, ঘোর রক্তবর্ণ হয় মুখ। আগের মতই জীবন যাপন ক'রে যায়।

ওই ঘটনার কিছুদিন পরে থেরেসার তীব্র বাসনা জাগে ক্ষুদে কলম্বেলকে পুনরায় পদানত ক'রতে। সংগে সংগে লাফিয়ে পিঠে চড়ে চাবুকের আঘাত করে। পরিণতি

আগের বারের মতোই হয়, সেই খড়ের-গাদা, সেই আচার-ব্যবহার ক্রিয়া-কলাপ !—

সকলের সামনে বোনের মতোই থেরেসার আচরণ অব্যাহত রইলো, কলম্বেলের প্রশান্ত সহনশীলতাও অটুট থাকলো, কিন্তু শিশু বয়েসের মতো সকলের আড়ালে কামড়াকামড়ি ধস্তাধস্তিতে ক্লান্তিহীন হ'য়ে উঠলো ওরা দু'জনে। পরিবর্তনের মধ্যে শুধু দেখা যায় এতোদিন পরে জয়-মাল্য লাভ হ'য়েছে পুরুষের।

এর পর থেকে কলম্বেলকে নিজের ঘরেই আহ্বান জানায় থেরেসা। গলির দরজার চাবি একটা তাকে দিয়ে দেয়। মায়ের ঘরের ওপর দিয়ে কলম্বেল এসে ঢোকে সে ঘরে রাত্তির বেলায়, বুড়ি তখন ঘুমোয়। ওদের নির্লিপ্ত হাবভাবে কেউ কিছু সন্দেহ ক'রতে পারে না। আরো কিছুদিন গেলে দিনের বেলাতেও প্রণয়ী-যুগলের মিলনের ব্যবস্থা শুরু হয়। সাধারণতঃ রাত্তিরে খাওয়ার আগে কলম্বেল প্রতীক্ষারত থেরেসার কাছে আসে; সে এলেই জানলাগুলো বন্ধ ক'রে দেয় থেরেসা, পাছে পাড়ার পাঁচজন ঘুণাক্ষরেও জানতে পারে।

সব সময় যাতে দুজনে দুজনকে দেখতে পায়—এমনি মনের অবস্থা হ'য়ে ওঠে ওদের। এর মানে মোটেই এমন নয় যে কলগুঞ্জনে মুখর হ'য়ে উঠতে ওরা লালায়িত। কে কাকে কামড়াকামড়ি ক'রে হারাতে পারে—এরি নেশা

ছিলো ওদের। চাপা গলায় প্রচণ্ড ঝগড়ায় মেতে উঠতো ওরা, বাইরের লোক পাছে জানতে পারে সেই ভয়ে চীৎকার কিংবা মারামারি ক'রতে পারত না।

একদিন সন্ধ্যেবেলা জুতো খুলে নিঃশব্দে আসছিলো কলম্বেল, হঠাৎ থেরেসাকে দেখতে পেয়ে টপ্ ক'রে তাকে জড়িয়ে ধরে উঁচু ক'রে তুলতে চেষ্টা করে। থেরেসা প্রাণ-পণে ছাড়িয়ে নিতে চায়, বলে: আঃ, ছেড়ে দাও বল্‌ছি, আমায় একা থাকতে দাও! জানো তো আমার জোর বেশি, কেন শেষে মার খাবে!—

সেই কাষ্ঠ হাসি হেসে গুজ্ গুজ্ করে কলম্বেল: মারো না দেখি! বলেই তাকে আছড়ে ফেলে দেবার জন্যে জোরে নাড়া দেয়। থেরেসা তাকে জড়িয়ে ধরে। রোজ এমনধারা কাণ্ডই এদের হয়, কলম্বেলই কার্পেটের ওপর পড়ে গিয়ে নড়াচড়া বন্ধ করে। কিন্তু একদিন থেরেসা হঠাৎ হুম্‌ড়ি খেয়ে পড়ে গেল আর সংগে সংগে কলম্বেল এক ঝট্‌কায় তাকে পেছনদিকে ছুঁড়ে দিলো। আজ জয় হোলো তার!···

অপমানকর হাসি হেসে কলম্বেল বললে: কেমন! দেখলে তো তোমার গায়ের জোর মোটেই বেশি নয়! হাঃ হাঃ হাঃ!······

মুখে এক ফোঁটা রক্ত নেই যেন মনে হয়। থেরেসা নীরবে আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়ালো, চেপে ধরলো কলম্বেলকে দৃঢ় হাতে। রাগে কেঁপে কেঁপে উঠছে দেখা গেল। মিনিট-

খানেক নিঃশব্দেই চললো তাদের ধস্তাধস্তি, শেষে সব শক্তি প্রয়োগ ক'রে কলম্বেলকে ছুঁড়ে দিলে পেছনে। সেখানে একটা সিন্দুকের কোণায় গিয়ে লাগালো তার মাথাটা, সশব্দে লুটিয়ে পড়লো সে মেঝের ওপর।

জোরে একটা শ্বাস টেনে আয়নার সামনে চুলগুলো ঠিক ক'রে নেয় থেরেসা। জামার ভাঁজ ঠিক ক'রতে থাকে, একবারও বিজিত কলম্বেলের দিকে তাকায় না। ও তো নিজেই উঠতে পারবে, তাই ওর পাঁজরায় পায়ের গুঁতো দেয়। থেরেসা লক্ষ্য করে কলম্বেলের মুখ মোমের মতো বিবর্ণ, চোখ কাঁচের মতো, মুখ কুঁচকোনো! মাথার ডান দিকে বিরাট এক গর্ত। কলম্বেল বেঁচে নেই!!

একটা শিহরণ বয়ে যায়, সর্বাংগে লোম খাড়া হ'য়ে ওঠে। থেরেসা সেই নিস্তব্ধতার মাঝে চেঁচিয়ে বলে ওঠে: কী সর্বনাশ! এ আর বেঁচে নেই?

নিদারুণ ভয়ে আড়ষ্ট হ'য়ে মড়ার সামনে দাঁড়িয়ে থাকে থেরেসা; কলম্বেলের মা'র পায়ের শব্দ শোনা যাচ্ছে, বুড়ি ফ্রাঙ্কোয়ে কি কাজে কোথায় যাচ্ছে যেন। নানা শব্দ ভেসে আসছে বাইরে থেকে; রাতে আজ আবার খানাপিনার বন্দোবস্ত আছে, তারা এবার এসে যাবে, কে কখন তার ঘরে এসে হাজির হবে কে জানে? ভাবে গোপন লীলা-খেলার প্রত্যক্ষ প্রমাণ এখন তারই ঘাড়ের ওপর পড়েছে! উঃ, কী ভার ওই ক্ষুদে মানুষটার।—

পাগলের মতো পায়চারি ক'রতে থাকে থেরেসা, মাথায় হাতুড়ির ঘা পড়ছে মুহুর্মুহু! এ অপযশের হাত থেকে উদ্ধার পেতে হবেই হবে। কী অসহায় সে! কোথায় লুকোয় একে? আলমারি? মোটেই তাতে জায়গা নেই। বিছানার কোণ? অসম্ভব, এতো বড়ো কাণ্ডের আড়াল হবার মতো যোগ্যতা এ ঘরের নেই! কতো পাপ গোপন ক'রতে সহায়তা করতো এই ঘর, কিন্তু আজ সে আর কোনো সাহায্যই ক'রবে না!

অবরুদ্ধ জানোয়ারের মতো ছট্‌ফট্‌ করে থেরেসা, হঠাৎ মনে হয় জানলা গলিয়ে ওটাকে ফেলে দিলে কেমন হয়? কিন্তু তাতে তো কলম্বেলকে খুঁজে পাওয়া যাবে, সেই সংগে পাওয়া যাবে তার হত্যাকারিণীকে।—তাহ'লে?

জানালার পর্দা সরিয়ে ফেললো থেরেসা—বাইরে থেকে যদি কোনো হদিস পাওয়া যায়। পাওয়া গেল বটে! ওই তো সামনের বাড়িতে র'য়েছে পুরুষত্বহীন বাঁশি-বাজিয়েটা। পোষমানা কুকুরের মতো রোজই তো তার কাছে প্রসাদ প্রার্থনা করে। জুলিয়েনের মূর্তি চোখে পড়তেই তার বিবর্ণ মুখে হাসির বিদ্যুৎ খেলে যায়—মুক্তি! মুক্তি! এই পথেই রয়েছে তার মুক্তি! একটা অপরাধের বিনিময়ে ওই অমানুষটাকে সে তার দেহ, প্রেম, সর্বস্ব দান ক'রবে। ও লোকটাকে সে যে ভালোবাসেনি তার কারণ ও ভারি ভদ্র প্রকৃতির—তা হোক, এখন থেকে ওকে ভালো-

বাসবে, দেহের উপাচারে ওকে কিনে নেবে; আর এসবের বিনিময়ে নিশ্চয় তার কুকীর্তির চিহ্ন মুছে ফেলতে লোকটা তাকে সাহায্য ক'রবে !—

কাপড়ের বোঁচকার মতো লাশটাকে বিছানার ওপর ছুঁড়ে দিয়ে তৎক্ষণাৎ জানলাটা খুলে ফেললো। এমনই পরিস্থিতিতে জুলিয়েনের দীর্ঘ দিনের তপস্যা সার্থক হোলো, পেল প্রেমের আমন্ত্রণ !

জুলিয়েনকে যেন নিশির ডাকে পেয়েছে, তেমনি ধারা হাঁটছে। বিছানায় কলম্বেলকে চিনতে পেরে একটুয়ো অবাক হোলো না। এখানে এভাবে কলম্বেলের আসাই সম্ভব বটে !

থেরেসার কথা প্রথমটা তার কানে যায়নি, শেষে কান পেতে শুনতে থাকে তার নির্দেশ : এখনই ঘর থেকে বেরুনো যাবে না, মাঝ রাত্তির পর্যন্ত অপেক্ষা ক'রতে হবে তাকে। আজ আবার পার্টি আছে, তাই তাড়াতাড়ি কিছু ক'রবার সুবিধে হবে না। অবিশ্যি এক পক্ষে এটা ভালোই হ'য়েছে, পার্টির জন্যে চট্ করে কেউ এ ঘরে এসে হাজির হবে না।— যথা সময়ে মড়াটাকে কাঁধে ক'রে নিয়ে গিয়ে জুলিয়েনকে ফেলে আসতে হবে চ্যাণ্টিক্লেয়ারের জলে—সেই বো-শোলেই স্ট্রীটের একেবারে প্রান্তসীমায়।—

এক এক ক'রে মতলবটা জানিয়ে দেয় থেরেসা।

কিছুক্ষণ চুপচাপ। জুলিয়েনের কাঁধে হাত রেখে এক

সময় জিজ্ঞেস করে : বুঝেছো তো জিনিসটা ? রাজী তো ?

শিউরে উঠে সে বললে : হ্যাঁ, হ্যাঁ, তোমার খুশি মতোই কাজ ক'রবো। আমি তো তোমারই।—

সামনের দিকে ঝুঁকে পড়লো থেরেসা।

জুলিয়েন বুঝতে পারে না তার উদ্দেশ্য। তখন থেরেসা বলে : একটা চুমু··

হিম-শীতল মুখের ওপর চুম্বন-রেখা এঁকে দেয় জুলিয়েন। তারপরই নেমে আসে নিস্তব্ধতা।

বিছানার ওপরের পর্দা টেনে দিয়ে থেরেসা আর্ম-চেয়ারে আশ্রয় নেয়, জুলিয়েনও বসে। অন্ধকারে সবাই ডুবে যায়। ফ্রাঙ্কোয়ের গলা পাওয়া যাচ্ছেনা, বহু দূর থেকে ক্ষীণ শব্দ মাঝে মাঝে ভেসে আসে। এ ঘর যেন নিদ্রাচ্ছন্ন হ'য়ে পড়েছে, লম্বা লম্বা ছায়ায় ভরে গেছে ইতস্তত! এক ঘণ্টাই হবে বোধ হয়, কেউ কোনো কথা কয় না! জুলিয়েনের মাথায় দপ্ দপানি চলেছে একটানা, কোনো চিন্তা ঠাঁই পায় না তার মনে। থেরেসার বহু বাঞ্ছিত সংগ লাভে ধন্য হ'য়েছে সে, এ কী কম তৃপ্তির? পর মুহূর্তেই মনে পড়ে মৃতদেহের কথা—সর্বাংগ হিম হ'য়ে আসে, বুঝি অজ্ঞান হ'য়ে পড়বে! নানান্ কথা মনে হয় তার! কী আনন্দেই না ওই ক্ষুদে শয়তানটাকে ফেলে দিয়ে আসবে জলে, জায়গাটা তার ঠিক খেয়াল করা হ'য়ে গেছে! আপদকে বিদায় করে এ'লে দুজনে নিষ্কণ্টকে বিহার ক'রতে পারবে।

এই অভাবিত সৌভাগ্যের স্বপ্ন দেখা সকাল বেলাও সম্ভব হয়নি—এটা মিথ্যে নয়। কিন্তু মৃতের সংগে একই বিছানায় সে বসে আছে মনে হ'তেই বুকের রক্ত জল হ'য়ে যায়।—

সেই মৃত্যুর স্তব্ধতা ভেঙে ঘড়ি বেজে ওঠে। থেরেসা ধীর গতিতে উঠে গিয়ে ড্রেসিং টেবিলের বাতিটা জ্বালিয়ে নেয়। স্বভাবসুলভ প্রশান্তি ফিরে পেয়েছে যেন, ভুলে গেছে সিল্কের পর্দার আড়ালে পড়ে আছে সদ্যমৃত একজন মানুষ!

চুল খুলতে খুলতে মাথাটা পর্যন্ত না ফিরিয়ে সে বলতে থাকে: পার্টিতে যাবার জন্যে তৈরি হ'তে চললুম, কেউ এলে খাটের পেছনে লুকিয়ে প'ড়ো—

জুলিয়েন বসে বসে দেখে ওর সাজ-সজ্জা। এর মধ্যেই ওই নারী প্রণয়ীর মতো ব্যবহার শুরু ক'রে দিয়েছে দেখা যায়। দুরু দুরু বুকে লক্ষ্য করে ধ্যানের লক্ষ্মীকে চুল বাঁধতে। পিঠের আবরণ সরে গেছে, দেখা যাচ্ছে কুনুই, মৃণালের মতো হাত দুটি....অপরূপ, অসাধারণ! আচ্ছা, থেরেসার এই যৌবন-সম্ভার প্রদর্শনের উদ্দেশ্য আছে কি কিছু? ওকে ওই দুরূহ কাজের উপযুক্ত ক'রবারই কি এটা গোপন প্রচেষ্টা?

জুতোজোড়া পায়ে দিতে যাবে, বাইরে পদ শব্দ শোনা যায়। তাড়াতাড়ি নীচু গলায় থেরেসা বলে: লুকিয়ে পড়ো, লুকিয়ে পড়ো খাটের পেছনে।

বলেই ছেড়ে রাখা জামা কাপড়ের রাশি কলম্বেলের মৃত দেহের ওপর চাপা দিয়ে দেয়। তাড়াতাড়ি ক'রে ফ্রাঙ্কোয়ে কথা কইতে কইতে ঘরে ঢোকে: তোমার জন্যে সবাই অপেক্ষা ক'রছে যে দিদিমনি।

শান্ত কণ্ঠে থেরেসা উত্তর করে: এই যে এলুম গো বাছা। এসেছো যখন গাউনটা একটু ধরো তো।

পর্দার ছোট্ট একটা ফোকর দিয়ে ওদের দুজনকে দেখতে পাচ্ছিলো জুলিয়েন। মেয়েটার এরকম স্পর্ধায় সর্বাংগ কেঁপে ওঠে, দাঁতে দাঁতে এমন ঠক্‌ঠকানি শুরু হয় যে হাত দিয়ে থুতনিটা চেপে ধরে। পাশেই একটা শেমিজের তলা দিয়ে কলম্বেলের ঠাণ্ডা কন্‌কনে পা একখানা বেরিয়ে র'য়েছে—ফ্রাঙ্কোয়ে এক বার যদি পর্দাটা সরিয়ে দেয়, তাহলে?

কচি মেয়েদের মতো বল নাচে যাচ্ছে বলে থেরেসার কতোই যেন আনন্দ, তেমনি হালকা গলায় ফ্রাঙ্কোয়েকে সাবধান ক'রে দেয়: দেখো, ফুল নষ্ট হ'চ্ছে কিন্তু!

তারপরেই হেসে ওঠে।

সাদা বসন ভূষণ পবিত্রতার প্রতিমূর্তি যেন! অপরূপ দেখতে হয় থেরেসাকে, পরিষ্কার গাউনের ঔজ্জ্বল্য তার উন্মুক্ত পিঠে, ঘাড়ে, সুডৌল হাত দুটিতে পরিব্যাপ্ত!

বুড়ি ফ্রাঙ্কোয়ে তো মুগ্ধ হ'য়ে যায়। বার বার বলে: কী সুন্দর তুমি দিদিমনি! কিন্তু মালাটা কই, মালা—

ফ্রাঙ্কোয়ে মালাটা খুঁজতে বিছানার পর্দা সরিয়ে ফ্যালে আর কি! আতংকে জুলিয়েনের মুখ দিয়ে চীৎকার বেরিয়েই পড়ত কিন্তু থেরেসা আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে আগের মতোই হাসছে! কোনো রকম তাড়াতাড়ি না ক'রে নির্দেশ করেঃ না না, ওখানে নয়, সিন্দুকের ওপর! খবরদার আমার বিছানায় হাত দিয়ো না, ওখানে কতকগুলো জিনিস রেখেচি, নাড়াচাড়া ক'রলে সব একাকার হ'য়ে যাবে!

মুকুটের মতো ক'রে ফুলের মালাটা পরিয়ে দেয় ফ্রাঙ্কোয়ে। তার এই বেশ-বাস বারে বারে দেখে ফ্রাঙ্কোয়ে বললে, তোমার মতো পবিত্র কুমারী মেয়ে কোনো গির্জাতেই পাওয়া যাবে না!

হেসে ওঠে থেরেসা ওই কথা শুনে। তারপর আয়নায় শেষ বারের মতো নিজের চেহারাটা দেখে নিয়ে জানায়ঃ চলো নীচে যাই। ওই বাতিটা নিভিয়ে দাও।-

অন্ধকারের মাঝে দরজা বন্ধ হওয়ার শব্দ শোনে জুলিয়েন। বারান্দা দিয়ে দ্রুত চলেছে থেরেসা, ভেসে আসে তারি ধ্বনি। চোখের সামনে নিশ্ছিদ্র রাত্রির আবরণ নেমে এলো। পাশেই যে ওটা পড়ে রয়েছে—সেই তীব্র অনুভূতি তাকে হতচেতন ক'রে তোলে। কোথা দিয়ে হু হু করে সময় বয়ে যায় জানতে পারে না।

হঠাৎ সিল্কের কাপড়ের খস্‌খসানিতে বুঝতে পারে থেরেসার আগমন। থেরেসা ভেতরে না ঢুকে আলমারির

তাকের ওপর কি যেন রাখলো। চাপা স্বরে বললে : দ্যাখো, খাওয়া দাওয়া তো কিছু হয়নি—কিছু খেয়ে নাও। বুঝেছো ?

আবার গাউনের খস্‌খসানি, বোঝা গেল থেরেসা চলে যাচ্ছে। জুলিয়েন উঠে দাঁড়ায়—বিছানার ওখানে থেকে দম বন্ধ হ'য়ে এসেছে, আর থাকা চলবে না। আটটা বেজে গেল—ওঃ, এখনো চার ঘণ্টা। নিঃশব্দে পায়চারি ক'রতে থাকে। বাইরে থেকে সামান্য এক ফালি আলো ঘরে এসে পড়েছে, তারি কল্যাণে আসবাব-পত্তরকে চেনা যাচ্ছে তবু।

বিছানার ওখানে কার নিশ্বাস পড়লো না ? একবার, দুবার, তিনবার। সর্বাংগে কাঁটা দিয়ে ওঠে জুলিয়েনের। খুব মনোযোগ দিয়ে অনেকক্ষণ ধরে শোনার চেষ্টা করে, শেষে বুঝতে পারে নীচে যে আমোদ-প্রমোদ হ'চ্ছে—এ শব্দ তারি! থেরেসা—শ্বেতাম্বরী থেরেসা ওয়াল্‌জ্‌-নৃত্যে মাতিয়ে তুলেছে আসর, সারা বাড়িতে তারি আনন্দ-শিহরণ। কিন্তু সে ? সে বসে আছে একা এই ভয়াবহ কোণটিতে ভয়-কণ্টকিত হ'য়ে !

শুনতে পায় দশটা বাজার শব্দ—এইটুকু সময় কতো দীর্ঘই না মনে হ'য়েছে। হাতের কাছে রুটি, ফল ইত্যাদি খাবার পড়ে থাকতে দেখে পেটের জ্বালা মেটাতে বাধ্য হয়। রাত্তিরের যেন আর শেষ নেই···এখনো গান-বাজনার আওয়াজ বেশ স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে, নাচের দোলা এখানেও আসছে, ফলে ঘরখানা থেকে থেকে কেঁপে উঠছে।

জুলিয়েন একদৃষ্টে চেয়ে থাকে দরজার দিকে, চাবির ফোকর দিয়ে ক্ষীণ আলো একসময় দেখতে পায়। লুকোবার ব্যাকুলতা তার নেই, কেউ এসে পড়লেই বা কি, যা হবার হয় হোক!—

বাতি হাতে থেরেসার আবির্ভাব হয়: না না ফ্রাঙ্কোয়ে, ধন্যবাদ! তুমি খুব ক্লান্ত, শুয়ে প'ড়ো গে! আরে হ্যাঁ হ্যাঁ, আমি নিজেই এসব ছেড়ে ফেলতে পারবো।

দরজাটা বন্ধ ক'রেই চাবি লাগিয়ে দেয় থেরেসা। মুহূর্তের জন্যে স্তব্ধ হ'য়ে দাঁড়িয়ে থাকে, কথা না বলবার সংকেত করে। আনন্দ-উৎসব থেরেসাকে বিন্দুমাত্র অনুপ্রাণিত ক'রতে পারেনি, রঙ ধরাতে পারেনি মনের গোপন-কোণে। সে নীরবে বাতিটা নামিয়ে রেখে জুলিয়েনের সামনে বসে পড়লো। আধঘণ্টা কেটে যায়, কারুর মুখে ভাষা নেই, পরস্পরে শুধু চেয়েই আছে।

সদরে সশব্দে খিল পড়ে গেল, অতো বড়ো বাড়ি ঘুমের কোলে নেতিয়ে পড়লো। কিন্তু তবু থেরেসার দুর্ভাবনার শেষ নেই! ফ্রাঙ্কোয়ে যে একেবারে কানের কাছে রয়ে গেছে—ওইতো ঘুরে বেড়াচ্ছে সে তার ঘরের ভেতর। অবিশ্যি সেটা কয়েক মিনিট মাত্র, তারপর বিছানায় শুয়ে পড়বার শব্দ হোলো। শুনতে পাওয়া যায় বৃদ্ধা মা কিসের অস্থিরতায় যেন এ-পাশ ও-পাশ ক'রছে! একসময় দেয়াল ভেদ ক'রে বুড়ির নাক ডাকা শোনা যেতে লাগলো।

গভীরভাবে জুলিয়েনের দিকে চাইলো থেরেসা। একটি মাত্র কথা বললে : এসো !—

পর্দা সরিয়ে দিয়ে তারা শক্ত অনড় মৃত-দেহটাকে কাপড়ে জড়িয়ে ফেললো। কপালের ঘাম মুছে ফেলে থেরেসা দ্বিতীয়বার বলে : এসো !

কোনোরকম দ্বিধা না ক'রে জুলিয়েন কশাইয়ের মতো মড়াটাকে কাঁধের ওপর ঝুলিয়ে নিলো।

'আমি তোমার আগে আগে যাবো'—তাড়াতাড়ি মৃদুস্বরে বলে ওঠে থেরেসা : তোমার কোটটা আমি ধরচি, তুমি শুধু আমায় অনুসরণ করো।—

প্রথমেই ফ্রাঙ্কোয়ের ঘর ; প্রায় পেরিয়ে গেছে সেটা, মড়ার পা গিয়ে একটা চেয়ারে লাগলো। সেই শব্দে ফ্রাঙ্কোয়ের ঘুম ভেঙে যায়। এরা শুনতে পায় তার মাথা তোলার শব্দ, বিড়বিড় ক'রে ক'রে বকা। নিশ্চুপ হ'য়ে দাঁড়িয়ে থাকে দুজনে নিশ্বাস পর্যন্ত বন্ধ ক'রে রাখে। জুলিয়েন বোঝার ভারে ভেঙে পড়ে প্রতি মুহূর্তে আশংকা করে—ওই মা এসে হাজির হোলো বুঝি ; অবাক ক'রে দেবে তাদের এ ব্যবস্থা প্রত্যক্ষ করে।—যাই হোক ফ্রাঙ্কোয়ের ঘুমিয়ে পড়তে দেরি হয় না, ওরাও চুপি চুপি বারান্দায় গিয়ে পৌঁছায়।

আর এক ভীতি এখানে অপেক্ষা ক'রছিলো তাদের জন্যে—মার্কুইসের ঘরের দরজা তখনো ভেজানো, ক্ষীণ

আলো বিচ্ছুরিত হ'চ্ছে সেইটুকু পথ দিয়ে। তারা না পারে এগুতে না পারে পেছুতে। প্রায় মিনিট পনেরো দাঁড়িয়ে রইলো তারা—থেরেসা যথাশক্তি সাহায্য করে জুলিয়েনকে। তারপর আলোর চিহ্নটুকু মুছে যেতেই একতলায় পৌঁছে যায় তারা। যাক্ বাঁচা গেল—আর তাদের পায় কে!···

সেই পুরোনো মান্ধাতার আমলের দোরটি খুলে ফেললো থেরেসা। কোয়াটার ফেম্‌স্ পার্কের মাঝামাঝি হাজির হ'য়ে জুলিয়েনের হুঁশ হয়—সিঁড়ির ধাপের ওপর বল-নাচের সাদা পোষাক পরে থেরেসা দাঁড়িয়ে; সে যতক্ষণ না ফেরে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা ক'রবে! থেরেসা অপেক্ষা ক'রবে!······

জুলিয়েনের গায়ে যেন ষাঁড়ের মত জোর দেখা দিয়েছে! ছোটবেলায় গ্রামের কাঠুরেদের সংগে জংগল থেকে কত কাঠ সে বয়ে এনেছে আমোদ ক'রে। আজ এই পাজীটার শরীরটাকে ঠিক পাখির ছানার মতো বয়ে নিয়ে চললো। একে নিয়ে যেতে কোনো রকম কষ্ট না হওয়ায় কেমন একটা উৎকট আনন্দ বোধ করে সে। ভবিষ্যতে কোনোদিনই এ আর তাকে অপমান ক'রতে, মুখ ভেঙ্‌চাতে পারবে না, এ কথা মনে হয় জুলিয়েনের। একটা ধাক্কা দিয়ে মড়াটাকে উঁচু ক'রে নিয়ে দাঁতে দাঁতে চেপে জোর কদমে এগিয়ে চলে।—

সারা শহর অন্ধকারে ঢেকে গেলেও পার্কে আলো

মিট মিট ক'রছে, ক্যাপ্টেন পিদোর জানলাতেও। অস্বস্তি-ভরে ভদ্রলোক বিছানায় শুয়ে এপাশ ওপাশ ক'রছেন, পর্দার ওধার থেকেও তা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। জুলিয়েন ধাঁ ক'রে বাড়ির ছায়ায় গা ঢাকা দেয়। হঠাৎ কাশির শব্দে বুকের রক্ত জল হ'য়ে গেল—ছুটে একটা দরজার গোড়ায় লুকিয়ে পড়ে জুলিয়েন। চিনতে পারে গলাটা এম, স্যাভোর্নিনের স্ত্রীর। তিনি জানলায় এসে দাঁড়িয়েছেন হাওয়া খেতে। দুর্দৈব ছাড়া আর কী! সাধারণত এ সময় পার্ক নিঃঝুম থাকে। যাই হোক মাদাম স্যাভোর্নিন স্বামীর পাশে ফিরে যান, স্বামীর নাকের গর্জন জুলিয়েন পথ থেকেও শুনতে পায়।

এক রকম ছুটেই পার্কটা পেরিয়ে যায় জুলিয়েন। বো-সোলেই ষ্ট্রীটের স্বল্প পরিসর জায়গায় পা দিয়ে সহজ ভাবে সে নিশ্বাস নেয়। ঘিঞ্জি বাড়ির ফাঁক দিয়ে তারার আলো পর্যন্ত প্রবেশ ক'রবার উপায় নেই। খানিকটা নিরাপদ হওয়ায় এবার তার বাকী পথটুকু ছুটে যেতে ইচ্ছে হ'তে লাগলো। এটা যে বিপজ্জনক কাজ তা বুঝলেও পেছনের ফাঁকা পার্ক আর মাদাম স্যাভোর্নিন ও ক্যাপ্টেনের বাড়ির আলো দুটো যে লক্ষ্য ক'রছে এক জোড়া চোখের মতো। পাথরের ওপর জুতোর ঘষ্ড়ানিতে এমনি শব্দ হ'চ্ছে—মনে হয় কে যেন আসচে পেছন পেছন। হঠাৎ ভারি পায়ের শব্দে থেমে পড়লো জুলিয়েন।

যাঃ, সৈন্যবাহিনীর অফিসাররা আমোদ-আহ্লাদ ক'রে ফিরছে বোধ হয়! কী করা যায় এখন? ফিরে যাওয়া কিংবা লুকিয়ে পড়ার কোনোই পথ নেই। এখন উপায়? জুতোর শব্দ, তরোয়ালের ঝন্‌ঝনানি শুনে লোকগুলো আসছে কি ফিরে যাচ্ছে বোঝবার চেষ্টা করে সে। নাঃ, পায়ের শব্দ ক্রমে ক্ষীণ হ'তে ক্ষীণতর হ'য়ে গেল।—এগিয়ে চললো হাল্কা পায়ে সে আবার।

শহরের তোরণ এসে যায়, জুলিয়েন তার ভেতরে ঢুকে পড়ে চলতে থাকে। কেমন ভয় ভয় ক'রছে যেন। নীল কুয়াশায় আকাশ আর মাটি একাকার ক'রে দিয়েছে, নতুন হাওয়া এসে তাকে নেড়ে চেড়ে উন্মুখ ক'রে দিচ্ছে, ওর মনে হয় অগণিত জনমণ্ডলীর নিশ্বাস পড়ছে ওর মুখের ওপর!—

ওই তো পোল, সাদা রাস্তা, গ্রেনাইটে তৈরি হুটো বেঞ্চির মতো পাঁচিল দেখা যাচ্ছে, চ্যান্টিক্লেয়ারের কলধ্বনিও শুনতে পাচ্ছে সে। খোলা জায়গা যতোটা সম্ভব এড়িয়ে খানিকটা নীচু হোলো, নীরব সাক্ষী আশেপাশে জটলা পাকাচ্ছে, পাছে তারা দেখে ফ্যালে—ভয়ে মরে জুলিয়েন। পোলের ওপরটা অগ্নি-পরীক্ষার মোক্ষম জায়গা, গোটা শহরের সামনে প্রকাশ হ'য়ে পড়বে! শেষে পোলটা পার হ'য়ে গেল।—

নদীর শিহরিত জলে হাসির আমেজ—এইখানেই ফেলতে হবে! ঝুঁকে পড়লো জুলিয়েন। কিন্তু ফেলে

দেবার আগে শেষবারের মতো ক্ষুদে কলম্বেলকে দেখে নিতে ভীষণ সাধ হয় তার। কয়েক মুহূর্ত উভয়ে মুখোমুখি হ'য়ে রইলো। দূরে একটা গাড়ি আসছে, শব্দ পাওয়া যাচ্ছে। কালবিলম্ব না ক'রে আস্তে আস্তে তুলে ধরে দেহটাকে। কি ভাবে কি হোলো খেয়াল নেই, তবে হঠাৎ মড়ার হাতটা কেমন ক'রে না জানি জুলিয়েনের কাঁধে জড়িয়ে যায়! আশ্চর্য উপায়ে রক্ষা পেল সে! কলম্বেল তাকেও সংগে ক'রে নিতে চাইছিলো!

অবসাদে ভেঙে পড়ে পাথরের বুকে বসে—হঠাৎ নিজেকে জুলিয়েন আবিষ্কার করে। শিরদাঁড়া বেঁকে গেছে, পা টন্ টন্ ক'রছে—আঃ, ভারি শ্রান্ত সে। কলহাসিনী পাহাড়ী নদী চ্যান্টিক্লেয়ার ছুটে চলেছে···দুচোখ ভরে আসছে ঘুমে। ওখানেই একটু গড়িয়ে নেবার ইচ্ছে হয় তার! কলম্বেল তাকে সংগে নিতে চাইছিলো, এ বিষয়ে কোনো ভুল নেই

থেরেসার কথা মনে হয়, সে অপেক্ষা ক'রছে। সেই সাদা সিল্কের গাউনে ঢাকা কমনীয় তনুদেহলতা ভাঙা সিঁড়ির ধাপের ওপর দাঁড়িয়ে আছে—জুলিয়েন স্পষ্ট দেখতে পায় যেন। বোধ হয় এখন ঠাণ্ডা বোধ ক'রছে বলে ঘরে আশ্রয় নিয়েছে। কিন্তু প্রতীক্ষা ক'রতে ভোলেনি। হ্যাঁ থেরেসা তারি অপেক্ষারত। এর আগে কোনো মেয়েই তার জন্যে অপেক্ষা করেনি···আর এক মিনিট

তারপরই সে পৌঁছে যাবে সেই স্বপনপুরীতে! কিন্তু পা দুটো যে অসাড় হ'য়ে গেছে···সত্যিই ঘুমিয়ে পড়বে না তো? সে কী তা'হলে ভীতু! নিজেকে জাগিয়ে তোলবার জন্যে থেরেসার নগ্নসৌন্দর্য চোখের ওপর ভাসিয়ে নিতে চেষ্টা করে—সেই মৃণাল দুখানি হাত, সেই মদির পরিবেশ, বহু-বাঞ্ছিত মদির সুধার পরশে এখনো অধরকোণে জ্বালা ধরছে। সে আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করতে পারবে না, দরকার হ'লে হামাগুড়ি দিয়েই যাবে জুলিয়েন।

কিন্তু পরাজয় বহু আগেই হ'য়ে গেছে সংগ্রামে—পরাভূত প্রেম অন্তর্হিত হ'য়েছে নিঃশেষে। থেরেসার মূর্তি মলিন হ'য়ে এসেছে, মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে বিচ্ছেদের পাঁচিল। ঘুম চাই, ঘুম—চির নিদ্রার মোহন-অঙ্কে ঠাঁই পেতে চায় তার সারা অন্তর, আর কিছু নয়। কাজ নয়, বাঁশি বাজানো নয়, কোনো কিছু সম্ভব নয় তার দ্বারা, তবে কেন সে ঘুমোবে না? সত্তা বলে কোনো কিছুই অবশিষ্ট নেই, এবার শুতে হবে। আর একবার নদীর দিকে চোখ ফেরায় জুলিয়েন, যদি কলম্বেল তখনো সেখানে থেকে থাকে।

চ্যান্টিক্লেয়ারের প্রশস্ত বুক ক্রমশ উদার হ'তে উদারতর হয়, তরংগভংগে কলহাস্যে কতো গান কতো সুর জাগিয়ে তোলে; ছায়া ঢাকা নগরী কী শান্তিময়ী, বারেক থেরেসার নাম ধ্বনিত হ'য়ে ওঠে জুলিয়েনের মুখে মৃদু হ'তে মৃদুতর

স্বরে—পরমুহূর্তে গড়িয়ে পড়লো সে নদীর বুকে। বহুদূর পর্যন্ত উৎক্ষিপ্ত হোলো জলধারা, চ্যান্টিক্লেয়ার আগের মতোই মাটির বুক চিরে গান গেয়ে ছুটে চললো বাধাহীন বিরামহীন।

মৃতদেহ দুটি পরে উদ্ধার করা হোলো। দুজনে মারামারি করে মারা গেছে অনুমান করলো সবাই। মুখে মুখে একটা গল্পও শোনা যায়—কলম্বেলকে ঠাট্টা তামাসার জন্যে জুলিয়েন শিক্ষা দিয়েছে। তার মাথায় আঘাত করে মেরে ফেলে শেষে পোল থেকে লাফিয়ে পড়ে সে আত্মহত্যা ক'রেছে।

তিন মাস পরের ঘটনা—মাদমোয়াজেল থেরেসা মার্সানীর সংগে তরুণ কাউণ্ট ভেদেউলের বিয়ে হ'য়ে গেল। বিয়ের দিন থেরেসার পরিধানে ছিলো মর্মরশুভ্র পরিচ্ছদ, সুন্দর মুখখানিতে উদ্ধত পবিত্রতা !!

হাতে-খড়ি

সে অনেক দিনের কথা, রোমের স্যাভেলি পরিবারে বুসিয়োলো এবং পিয়েত্রো পায়োলো নামে দুটি বন্ধু বাস ক'রতো। ওঠা-বসা-বেড়ানো সবি তাদের একত্রে সমাধা হোতো ব'লে নাম দিয়েছিলো সবাই 'মাণিক জোড়'। রূপোর চামচ মুখে ক'রেই জন্মেছিলো তারা, অভাবের নাম-গন্ধ ছিলো না তাদের আশেপাশে।

আইন অধ্যয়নের বাসনা হওয়ায় একদিন তারা আত্মীয়-স্বজনের কাছে বিদায় নিয়ে বোলোগ্না যাত্রা ক'রলো। সেখানে তারা খুব পরিশ্রমের সংগে পড়াশুনা ক'রতে থাকে। এরা দু'জনে আইন-শাস্ত্রের দুটি ভিন্ন শাখার বিষয়বস্তু সাধনা করে। তাই ষ্ট্যাটুটারী আইনের ছাত্র বুসিয়োলোর শিক্ষা সিভিল আইন অধ্যয়নকারী বন্ধু পিয়েত্রোর আগেই শেষ হ'য়ে যায়। সে তখন রোমে ফিরে যেতে মনস্থ করে। বন্ধুকে ডেকে বলে: ভাই, গ্র্যাজুয়েট্ তো হ'য়ে গেছি, এবার বাড়ি ফিরে যাবো মনে করছি।

পিয়েত্রো পায়োলো অনুরোধ জানায়: দোহাই বন্ধু, আমায় একা ফেলে যেয়ো না। সামনের এই শীতটা শুধু, তারপর মধু মাসে একসংগে ঘরে যাবো। তুমি বরং এক

কাজ করো, এই সময়টা মিছিমিছি নষ্ট না ক'রে অন্য কিছু শিখে নাও।

বন্ধুর প্রস্তাব খুশি মনেই বুসিয়োলো অনুমোদন করে। তাই ভালো, একসংগেই ফেরা যাবে। শেষে আর মুহূর্ত মাত্র অপচয় না ক'রে মাষ্টার মশায়ের কাছে হাজির হ'য়ে বলে : আমার বন্ধুর লেখাপড়া যতদিন না শেষ হ'চ্ছে, ততদিন আমি এখানে থাকবো ঠিক ক'রেছি। এই ক'টা দিন আপনি যদি কোনো ভালো বিষয় আমাকে শেখান, তা'হলে বড্ড সুবিধে হয়।

মাষ্টার সানন্দে শেখাতে রাজী হ'য়ে জানতে চান, সে কোন্ বিজ্ঞান শিখতে চায়।

বুসিয়োলো তাতে বলে : কি ক'রে প্রেম ক'রতে হয় তাই আমি শিখতে চাই মাষ্টার মশাই। বলুন কি উপায়ে এ কাজ শুরু করা যায়।

বহু কষ্টে হাসি চেপে মাষ্টার মশাই জবাব দেন : সত্যি কথা বলতে কি, তোমার এই উদ্দেশ্য শুনে আমার ভারি ভালো লাগছে। অন্য কোনো বিষয় শিখতে চাইলে এ রকম সন্তুষ্ট হ'তে পারতুম না বোধহয়। যাই হোক, রবিবার সকালে তোমায় মাইনরে যেতে হবে। সেখানে শহরের সমস্ত মেয়েদের ঘোরা-ফেরা ক'রতে দেখতে পাবে। তাদের মধ্যে যাকে তোমার ভালো লাগবে তার পিছু পিছু গিয়ে তার বাড়িটা দেখে আসবে, পরে আমার কাছে এসে

জানাবে সব কথা। এই হোলো তোমার নতুন বিষয়ের প্রথম পড়া।

পরের রবিবার বুসিয়োলো মাষ্টার মশায়ের কথামতো মাইনরে হাজির হোলো। ছাখে নানান্ বয়েসী, নানা চেহারার মেয়েরা ঘুরে বেড়াচ্ছে সেখানে। তাদের মধ্যে একজনকে ভারি মনে ধরে যায়। মেয়েটির যেমন মুখশ্রী, তেমনি গায়ের রঙ। মেয়েটির পিছু নিয়ে বুসিয়োলো দেখে আসে তার বাড়ি। ওর কাণ্ড দেখে রূপসীটির বুঝতে দেরি হয় না যে, এই ছাত্র সন্থ সন্থ তার প্রেমে পড়েছে।

ওদিকে বুসিয়োলো ফিরে গিয়ে মাষ্টার মশাইকে জানায় তার সফলতার কথা। বলে: আপনার কথামতো কাজ ক'রতে আমার একটুয়ো ভুল হয়নি। আমার পছন্দ সই একটি মেয়েকে খুঁজেও পেয়েছি।

খুশি হন মাষ্টার মশাই তার কথায়; খানিক ঠাট্টা-তামাসা ক'রে বলেন: ছাখো বাপু, এবার তোমার কাজ হ'চ্ছে দিনে দু'বার কি তিনবার একটা ভালো গাড়ি চ'ড়ে ওই মেয়েটির বাড়ির সামনে দিয়ে যাওয়া। ভদ্রভাবে প্রাণভরে দেখে নিতে কোনো বাধা নেই; কিন্তু খবরদার, আদেখ্লের মতো হাঁ ক'রে ওর দিকে তাকিয়ে থেকো না কক্ষনো। সে যেন তোমাকে তার শুভানুধ্যায়ী বলে ধরে নিতে পারে, সেদিকে লক্ষ্য রেখ। দ্বিতীয় দফা পড়া দিয়ে দিলুম, ব্যবস্থা মতো কাজ ক'রে আমার সংগে দেখা কোরো। এখন যাও।

সেখান থেকে ছুটি নিয়ে বুসিয়োলো মেয়েটির বাড়ির সামনে ঘোরাফেরা শুরু ক'রে দেয়। যথেষ্ট মার্জিত চাল-চলন, আচার-ব্যবহার, কোনোরকম ত্রুটি যাতে না হয় সেদিকে খরদৃষ্টি রাখে বুসিয়োলো। মেয়েটি বুঝতে পারে তাকে দেখতেই ওর আগমন; তাই কয়েক দিন কেটে গেলে সে ফিরে ফিরে তাকাতে থাকে। বুসিয়োলো সসম্মানে অভিবাদন জানাতে তৎপর হয়, তার প্রত্যুত্তর মেয়েটিও দেয়। যেটুকু সংশয় ছিলো, এরপর তা নিঃশেষে দূর হ'য়ে যায়—মেয়েটি তাহ'লে তাকে ভালবেসেছে, বুসিয়োলো ভাবে।

মাষ্টার মশাই-এর কাছে ফিরিস্তি দাখিল ক'রে পরের নির্দেশের অপেক্ষা করে বুসিয়োলো। উনি তো মহা খুশি। বলেন: আজ পর্যন্ত তোমাকে যা যা ক'রতে বলেছি তা বর্ণে বর্ণে পালন ক'রেছো দেখছি। এবার অন্য ব্যবস্থা ক'রতে হবে। ওর সংগে আলাপ-পরিচয় আছে এমন কোনো ফিরিয়লির সাথে বন্দোবস্ত ক'রে তাকে দিয়ে কায়দা ক'রে ওই মেয়েটিকে জানাতে হবে, তুমি ওর শ্রীচরণের দাসানুদাস, তোমার শুভেচ্ছা এ পৃথিবীতে কেবল ওরই জন্যে জেগে আছে আর তাকে খুশি ক'রতে তুমি যে-কোনো কাজ ক'রতে পারো। এ-কথার উত্তরে মেয়েটি যাই বলুক না আমায় এসে কিছু গোপন না ক'রে জানালে পরের পন্থা বাৎলে দেবো, বুঝেছো?

বুসিয়োলো অনেক খুঁজে ওই রকম একটি মহিলাকে

যোগাড় ক'রলো। দেখলেই বোঝা যায় সে বেশ কাজের লোক। কিভাবে কি ক'রতে হবে জানিয়ে মোটা বখশিসের লোভ দেখায় বুসিয়োলো। ফিরিয়লিও যথাসাধ্য ক'রবার প্রতিশ্রুতি দেয়।

বুসিয়োলো ছুটি ফ্লোরিণ তার হাতে গুঁজে দিয়ে বলে: আমার ইচ্ছে এখুনি তুমি লা মাসকারেলা ষ্ট্রীটে যাও। সেখানে আমার প্রিয়া ম্যাডোনা গিয়াভানো থাকে; তাকে গিয়ে মিষ্টি ক'রে জানাবে আমি তার জন্যে যে-কোনো কাজই করতে রাজী আছি। সেই সংগে তার কাছে যতোটা পারো আমার প্রশংসা ক'রে এসো।

বুড়ি পুনরায় তাকে আশ্বস্ত করে কর্তব্য সম্পাদন সম্পর্কে। স্থির হয় বুসিয়োলো বুড়ির অপেক্ষায় সেখানে বসে থাকবে।

ঝুড়িতে ক'রে জিনিসপত্তর নিয়ে তো বুড়ি রওনা হ'য়ে পড়ে। গিয়ে ম্যাডোনাকে দরজার গোড়ায় বসে থাকতে দেখে অভিবাদন জানিয়ে বলে: ম্যাডোনা, আমার এই জিনিসপত্তরের মধ্যে কোনো কিছু যদি তোমার পছন্দ হয়, তা'হলে একটুও ইতস্ততঃ না ক'রে নিতে পারো।

মেয়েটির পাশে ব'সে বুড়ি ওড়না, ফিতে, আয়না—মেয়ে-ছেলেদের লোভনীয় নানান্ কিছু দেখাতে থাকে।

আছিকালের অনেক জিনিসপত্তরের ভেতর থেকে একটা ব্যাগ টেনে নেয় ম্যাডোনা। ভারি ভালো লাগে জিনিস-

টাকে। বলে: সত্যি বলছি, পয়সা থাকলে এটা আমি নিশ্চয় নিতুম।

ফিরিয়লি তাড়াতাড়ি বলে ওঠে: আরে না না, ও বিষয়ে তোমায় ভাবতে হবে না, যেটা খুশি হয় নিয়ে নাও না, এ সবের দাম আমি পেয়ে গেছি।

অসম্ভব রকম আশ্চর্য হ'য়ে ম্যাডোনো প্রশ্ন করে: এ কি বলছো তুমি বাছা! মানে কি এ-কথার?

কেঁদেই ফেলে—এমনিভাবে বুড়ি বললে: তা'হলে সবটাই শোনো, বলছি। বুসিয়োলো নামে একটি ছেলে তোমার কাছে আমায় পাঠিয়েছে। সে তোমায় ভালো-বাসে। এই দুনিয়ায় তোমার দয়া ছাড়া আর কিছুই চায় না, এমন কোনো কাজ নেই যা তোমার জন্যে সে না ক'রতে পারে। তাকে তুমি যদি সামান্য কিছু ফরমাস করো, সেই সৌভাগ্যের জন্যে ভগবানের কাছে চিরকৃতজ্ঞ থাকবে। তোমায় বলবো কি বাছা, অমন ভদ্র যোগ্য ছেলে আমি এতো বয়স পর্যন্ত আর একটিয়ো দেখিনি। তোমার সংগে একটি কথা কইতে পেলে সে ধন্য হ'য়ে যায়—আমার মনে হয় কি জানো? এভাবে সে নিজেকে নিঃশেষ ক'রে ফেলবে।

রেগে লাল হ'য়ে ওঠে মেয়েটি: একজন ভদ্রঘরের মেয়ের কাছে এই কুৎসিত প্রস্তাব ক'রতে তোমার একটু বাধলো না? লজ্জা হোলো না তোমার? যাক, দয়া করে ছেড়ে দিচ্ছি আজকের মতন, ভবিষ্যতে এলে শিক্ষা দিয়ে দেবো।

হুড়কোটা হাতে ক'রে ওর পিঠে এক ঘা কষিয়ে দেবার ইচ্ছে নিয়ে চেঁচিয়ে ম্যাডোনা বলে : ফের যদি এসেছো তো এমন শিক্ষা দেবো যে আর কোনোদিন এখানে আসতে হবে না।

মালপত্তর কোনোরকমে পুঁটলিজাত ক'রে বুড়ি ঝড়ের বেগে বেরিয়ে এসে জান বাঁচায়। এখনি ওই হুড়কোর স্বাদ পাচ্ছিলো সে পিঠের ওপর। অন্য কোথাও যাওয়া নিরাপদ নয় ভেবে সোজা বুসিয়োলোর কাছে গিয়ে হাজির হয়।

বুসিয়োলো উৎকণ্ঠিতভাবে খবরাখবর জানতে চায়। বুড়ি হাঁপাতে হাঁপাতে বলে : ওরে বাবা, হ'য়েছিলো আর কি! পৈতৃক প্রাণটা নিয়ে যে আসতে পেরেছি এই-ই যথেষ্ট। ও তোমার সংগে দেখাও ক'রবে না, তোমার কথাও শুনবে না। বাবা, যে হুড়কোটা উঁচিয়েছিলো, পিঠে পড়লে হাড়-গোড় কিছু থাকত না!

তারপর বুড়ি বুসিয়োলোকে ওসব মতলব ছেড়ে দিতে সনির্বন্ধ অনুরোধ জানায়।

বুসিয়োলো বুড়ির মুখে সব শুনে ভীষণ চিন্তিত হ'য়ে পড়ে। কালবিলম্ব না ক'রে মাষ্টার মশাইকে সব কিছু জানাবার জন্যে ছুটে যায়।

'হতাশ হোয়ো না, বুসিয়োলো',—বলেন মাষ্টার মশাই : এক ঘায়ে গাছ কাটা যায় না কোনোদিন। আজকে ওর বাড়ির সামনে দিয়ে যেতে কিন্তু ছেড়ো না তুমি। তোমাকে

দেখে কি করে, রাগ-টাগ করে কিনা···সব কথা আমাকে বলে যেয়ো।

বুসিয়োলো সেখান থেকে বেরিয়ে ম্যাডোনার বাড়ির সামনে হাজির হোলো। মেয়েটি ওকে দেখতে পেয়ে তাড়াতাড়ি ক'রে ঝিকে পাঠিয়ে দেয়, বলে, যা তো ঝি, ওই লোকটাকে গিয়ে বলতো ও যেন আজ রাত্তিরে আমার এখানে নিশ্চয় ক'রে আসে।

ঝি ঠিক ঠিক কথাগুলো বুসিয়োলোকে জানিয়ে আসে। বুসিয়োলো অবাক হ'লেও তাকে জানায়ঃ তাঁকে তুমি বোলো আনন্দের সংগে আমি নিমন্ত্রণ গ্রহণ করেছি। রাত্তিরে ঠিক সময়ে আসবো।

এতোখানি এগিয়েছে নতুন পাঠের বিষয়বস্তু, মাষ্টার মশাইকে এই পরিস্থিতির কথা এই বেলা জানানো ভালো।

মাষ্টার মশাই ব্যাপারটা শুনে প্রথম থেকেই অবাক হচ্ছিলেন, এখন সন্দেহ হয় ওই মেয়েটি তাঁর স্ত্রী নয় তো? তিনি বলেনঃ আলবাৎ যাবে তুমি সেখানে ওর কথা মতো।

ছোকরা যে নিশ্চয় যাবে সে কথা তাঁকে জানায়; তখন মাষ্টার জানান, রাত্তিরে মেয়েটির কাছে যাবার আগে তাঁর সংগে যেন অতি অবশ্য দেখা করে। বুসিয়োলো সম্মতি জানায়।

এখন ও মেয়েটি যে মাষ্টার মশায়ের স্ত্রী, সে বিষয়ে কোনো ভুল নেই; কিন্তু বুসিয়োলো ঘুণাক্ষরেও তা জানতো না।

এ ছাড়া মেয়েটিকে একাধিকবার মাষ্টার মশাই হিংসা ক'রেছেন—কারণ সারা শীতকালটা ছেলেদের সন্ধ্যেবেলায় পড়াতে পাবেন এই উদ্দেশ্যে তিনি ইস্কুল বাড়িতেই রাত কাটিয়েছেন, ওদিকে তাঁর স্ত্রী ঝিকে নিয়ে থেকেছে তাঁর বাড়িতে সম্পূর্ণ একা।

মাষ্টার মশায় এখন মনে মনে বলেন: আমার ঘাড়ের ওপর দিয়ে এ ছোকরার প্রেমের হাতেখড়ি হ'য়ে যাবে—এ আমি মোটেই বরদাস্ত ক'রবো না। সেইজন্যে কোথাকার জল কোথায় দাঁড়ায় সেটার দিকে লক্ষ্য রাখতে হ'চ্ছে দেখছি!

সন্ধ্যেবেলায় বুসিয়োলো তাঁর কাছে এসে জানায়, সে এবার রওনা হবার পথে। মাষ্টার মশাই তার যাওয়া শুধু একবার নয় বার বার যাতে হয় সেই শুভেচ্ছা জানান।

সে ভার বুসিয়োলোর ওপর ছেড়ে দেওয়াই ভালো, একথা জানিয়ে সে বিদায় নেয় সেখান থেকে। নিছক নির্বোধের মতো শুধু হাতে না গিয়ে যথেষ্ট সশস্ত্র হ'য়েই বুসিয়োলো অভিসারে রওনা হোলো—কোনো বিপদ সহজে না কাবু ক'রে ফেলে।

কয়েক মিনিট পরে মাষ্টার মশাই ছাত্রের গতি-পথ ধরে এগিয়ে চললেন জোর পায়ে। ওদিকে সে ছোকরা এ-সবের কিছু না জেনে সোজা মেয়েটির দোরে হাজির হ'য়ে আস্তে আস্তে টোকা মারে। সংগে সংগে মেয়েটি দোর খুলে দেয়, সে-ও ভেতরে ঢুকে যায়।

মাষ্টার মশাই-এর অবস্থা তখন কাহিল। মূর্ছা যান আর কি! তাহ'লে তাঁর অনুমান একটুয়ো মিথ্যে নয়! এ যে তাঁরই স্ত্রী। হায় হায় হায়! এ ছোকরা তাঁরই ওপর দিয়ে এ ব্যাপারটা রপ্ত ক'রে নিয়েছে!

ভাবতে ভাবতে প্রতিশোধ নেবার স্পৃহা তীব্র হ'য়ে ওঠে তাঁর, ঠিক করেন বুসিয়োলোকে হত্যা ক'রবেন। সেই চিন্তা ক'রে তাড়াতাড়ি ইস্কুলে ফিরে গিয়ে একখানা তরোয়াল নিয়ে ফিরে এসে বাড়ির দরজায় ঘন ঘন ধাক্কা দিতে থাকেন।

বুসিয়োলোকে নিয়ে ম্যাডোনা তখন আগুনের ধারে প্রেম-আলাপনে রত—অতো জোরে দরজায় ঘা পড়তে দেখে স্বামী এসে গেছে এই ধারণায় তাড়াতাড়ি বুসিয়োলোকে একগাদা ভিজে কাপড়ের তলায় লুকিয়ে ফেলে দরজার কাছে গিয়ে বলে: কে?

মাষ্টার চিৎকার ক'রে ব'লে ওঠেন: দোর খোল্ পাজী নচ্ছার মেয়েমানুষ—কতো বড়ো অসৎ তুই, সেইটাই আজ দেখাব।

তৎক্ষণাৎ দরজা খুলে দেয় ম্যাডোনা। ওঁকে তরোয়াল হাতে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে হাঁউমাউ করে ওঠে: ওমা, একী কাণ্ড! এর মানে কি?

সে তো তুই ভালো ক'রেই জানিস—বল্ কাকে বাড়িতে ঢুকিয়েছিস?

—ও আমার পোড়া কপাল। এ সব বলছো কি? তোমার

কি মাথাটাথা খারাপ হোয়ে গেছে ? চার ধার তন্নতন্ন ক'রে খুঁজে দ্যাখো, কাউকে পেলে কেটে ফেলো আমায়। কোনো-দিন স্বপ্নেও যা ভাবিনি, আজ কিনা সেই কাজ ক'রবো। কিন্তু দোহাই, শত্রুরা আশেপাশে র'য়েছে, তাদের কাছে তোমার মাথা হেঁট হ'য়ে যাবে, এমন কাণ্ড কোরো না।

কে কার কথা শোনে—মাষ্টার মশাই আলো নিয়ে আঁতিপাঁতি ক'রে নীচ ওপর দেখতে থাকেন। শোবার ঘরের তোষক-গদির কিছু আর অবশিষ্ট থাকে না, তরোয়ালের ঘায়ে আষ্টেপিষ্টে ছ্যাঁদা হ'য়ে যায় সব কিছু। কোনো উদ্দেশ্যই মেলে না আসামীর—মাষ্টার বোকা ব'নে যান।

স্বামী যখন খুঁজে বেড়াচ্ছিলেন, স্ত্রী আশেপাশে আলো নিয়ে কেবলি চেঁচিয়ে বলে : ওগো, তোমায় নিশ্চয়ই শয়তানে ভর ক'রেছে, এমন কাজ করাচ্ছে সেই দুষ্ট গ্রহই। এমনধারা কোনো খারাপ চিন্তা জীবনে আমি করিনি, আমার মাথার একগাছি চুলও যদি তোমার ধারণা মতো কোনো কুচিন্তা ক'রতো তাহ'লে আমি নিজেকে নিজেই নষ্ট ক'রে ফেলতে একটুয়ো ইতস্ততঃ ক'রতুম না। ভগবানের দোহাই, আর এভাবে প্ররোচিত হ'য়ে কষ্ট পেয়ো না।

মাষ্টার মশাই কাউকে খুঁজে না পেয়ে এবং স্ত্রীর ওই সব কথা শুনে খুশি হ'য়ে ওঠেন। তাকে বিশ্বাস করেন, ভাবেন নিশ্চয় প্রতারিত হ'য়েছেন। তাই আরো কিছুক্ষণ ঘোরা-ঘুরি ক'রে আলো নিভিয়ে ইস্কুলে ফিরে যান।

উনি বেরিয়ে যেতেই ম্যাডোনা দরজায় চাবি লাগিয়ে বুসিয়োলোকে কাপড়ের স্তূপের মধ্যে থেকে উদ্ধার ক'রে নিয়ে আসে। বিরাট ভোজে বসে যায় প্রণয়ী যুগল, নানান্ ধরনের পানীয়ে তারা বার বার গলা ভিজিয়ে নিতে থাকে। খানা খেতে খেতে মাষ্টারের স্ত্রী বার বার বলে : জানো, আমার স্বামী কিন্তু আমাদের ব্যাপার কিছুই জানতে পারছে না।

পানাহারের পর ম্যাডোনা বুসিয়োলোকে হাতে ধরে নিয়ে যায় তার শোবার ঘরে। উত্তপ্ত সংগলাভ করে দুজনে। দেখতে দেখতে বহুবাঞ্ছিত সুখরজনী অবসান হ'য়ে যায়।

বিদায় দেবার আগে বুসিয়োলোকে ম্যাডোনা সেই রাতেও আমন্ত্রণ জানায়।

সেখান থেকে বেরিয়ে মাষ্টারের কাছে হাজির হ'য়ে বুসিয়োলো বলে : আপনাকে এখন যে কথা আমি বলবো, সেটা শুনে নিশ্চয় আপনি হেসে উঠবেন।

সে আবার কেমন ধরনের তা মাষ্টার জানতে চান। তখন বুসিয়োলো গত রাত্রের সব কথা এক এক ক'রে বলে যায়। কি করে ভিজে কাপড়ের তলায় তা'কে ঢুকিয়ে দিয়ে মেয়েটা স্বামীকে কেমন ধোঁকা দেয় এবং স্বামী চলে গেলে সারা রাত দুজনে কতো ফুর্তি করে—সব ঘটনা অকপটে তাঁকে জানায়।

সারারাত জেগে কাটানোর জন্য এখন একটু ঘুমোনো দরকার। তাছাড়া আজও রাতে ম্যাডোনার সংগে দেখা

কয়ার কথা আছে, সে কথা জানিয়ে বুসিয়োলো চলে যায়।

মাষ্টার মশাই, তাঁর সংগে দেখা ক'রে তবে যেন সে অভিসারে যায়, সেই নির্দেশ দেন। সেও তাতে রাজী হয়···

মাষ্টার মশাই একা বসে জ্বলে-পুড়ে খাক হ'তে থাকেন। রাগে আগুন হ'য়ে ওঠে মাথার চাঁদি—কিছুতেই প্রকৃতিস্থ হ'তে পারেন না। ছেলেদের পড়ানো অসম্ভব হ'য়ে ওঠে—কেবলি ভাবেন রাত্তিরে কি ক'রে বুসিয়োলোকে হাতে হাতে ধরে ফেলে শিক্ষা দেবেন। ঢাল, তরোয়াল ইত্যাদি সেই উদ্দেশ্যে সংগ্রহ ক'রেও রাখেন।

বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যা হবো হবো হয়; বুসিয়োলো এ-সবের বিন্দুবিসর্গ তো জানে না। ভালো মানুষের মতো এসে বলে: আমি তা'হলে এখন যাচ্ছি।

—যাও, কাল ভোরে এসে সব কথা জানিয়ো।

বুসিয়োলো যথারীতি সম্মতিসূচক উত্তর দিয়ে জোর কদমে ম্যাডোনার বাড়ির দিকে এগিয়ে যায়। মাষ্টারও পর মুহূর্তে বেরিয়ে প'ড়ে অনুসরণ করেন তাকে, যেন একরকম হাত ধরেই সংগে চলেছেন। তাঁর ভাব দেখে মনে হয়, একসংগেই চৌকাঠ পেরুতে চাইছেন।

ম্যাডোনা তৈরী হ'য়েই ছিলো, সংগে সংগে মনের মানুষ-টিকে বাড়ির ভেতর ঢুকিয়ে নিয়ে দরজা বন্ধ ক'রে দেয়।

পর মুহূর্তে মাষ্টার মশাই সেখানে হাজির হ'য়ে দরজায় ঘা দিয়ে প্রচণ্ড চীৎকার ক'রতে থাকেন।

টপ্ ক'রে আলোটা নিভিয়ে ফেলে ম্যাডোনা ছোকরাটিকে একেবারে নিজের পেছনে নিয়ে দাঁড়ায়। তারপর দরজা খুলে স্বামীকে এক হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরে, অন্য হাতে বুসিয়োলোকে এমন কায়দা ক'রে ধাক্কা দিয়ে বাড়ির বার ক'রে দেয় যে, মাষ্টার টের পান না একটুয়ো। তারপর ভয়ার্ত চিৎকারে পাড়া মাথায় ক'রতে থাকে, সেই সংগে মাষ্টারকে জোর ক'রে জড়িয়ে ধরে রাখে।

পাড়ার লোকজন ছুটে আসে ম্যাডোনার চেঁচামেচি শুনে। ম্যাডোনার কথাই তারা বিশ্বাস করে, নিশ্চয় মাষ্টারের পড়াশুনো ক'রে ক'রে মাথা খারাপ হ'য়ে গেছে। তারা সবাই মাষ্টারকে মাথা ঠাণ্ডা ক'রে শুয়ে পড়বার জন্যে অনুরোধ করে। তাতে মাষ্টার বলে: কি ক'রে শোবো বলুনতো, এই পাজী মেয়েমানুষটা কাকে যেন ঘরে ঢুকিয়ে রেখেছে।

সে কথায় ম্যাডোনা মাথা চাপড়ে কান্না কাটি শুরু ক'রে দেয়, পাড়ার লোকে তার কোনো খারাপ আচার-ব্যবহার কখনো দেখেছে কিনা, সেকথা ম্যাডোনা তাদের কাছে জানতে চায়।

তারা বোঝাতে চায় মাষ্টারকে ম্যাডোনার মতো মেয়ে আর হয় না, ইত্যাদি, কিন্তু মাষ্টার কিছুতেই মানতে চান না। তিনি যে স্বচক্ষে একজনকে বাড়িতে ঢুকতে দেখেছেন।

ইতিমধ্যে মেয়েটির দুই ভাই এসে পড়ে। তাদের

দেখতে পেয়ে ম্যাডোনা কেঁদে ওঠেঃ দাদা গো, ওর মাথা খারাপ হ'য়ে গেছে! তোমরা দেখ, তা না হ'লে ও বলে কিনা বাড়ির মধ্যে একজন মানুষকে নাকি আমি ঢুকিয়ে রেখেছি। ও আমায় মেরে ফেলতে চায় গো, ও পাগল হ'য়ে গেছে নিশ্চয়!

ভায়েরা গর্জন ক'রে ওঠেঃ আমাদের বোনের সংগে এতো-দিন বসবাস ক'রে আজ তোমার এরকম ধারণা হ'য়েছে দেখে আমরা খুবই অবাক হচ্ছি!

মাষ্টারের মুখে সেই এক কথা—নিজের চোখে তিনি দেখেছেন একজনকে ঢুকতে, কাজে কাজেই···ইত্যাদি।

ভায়েরা ঘরদোর খোঁজাখুঁজি ক'রতে লেগে যায়। ঠিক হয়, যদি সত্যিই কেউ বাড়ি থেকে বেরোয় তাহ'লে ম্যাডো-নাকে চূড়ান্ত রকমের সাজা দেবে।

মাষ্টার সোজা সেই ভিজে কাপড়ের স্তূপের সামনে হাজির হ'য়ে নির্মমভাবে তরোয়ালের খোঁচা মারতে থাকেন। কিন্তু কোথায় বুসিয়োলো, গেল কোথায় সে?

ম্যাডোনা চেঁচিয়ে ওঠেঃ বলিনি ওর মাথা একেবারে গেছে। মাঝ্ থেকে অতো দামী কাপড়গুলো আমার গেল।

আরো কিছু খোঁজাখুঁজি ক'রে কোনো মানুষের হদিস না পেয়ে ভায়েরা নিঃসন্দেহ হোলো যে, মাষ্টারের বুদ্ধিভ্রংশ হ'য়েছে।

একজন বলেঃ লোকটা নিশ্চয়ই পাগল।

অগ্রজন সঙ্গে সঙ্গে বললো : আমাদের বোনের সম্বন্ধে যখনই অমন কথা বলতে শুনেছি তখনি এমন একটা কিছু হ'য়েছে অনুমান ক'রছিলুম বটে।

মাষ্টারের ক্রোধ ধূমায়িত হ'তে থাকে, নিজের চোখকে অবিশ্বাস করেন তিনি কি ক'রে? এদের কথাবার্তায় এখন একেবারে অগ্নিশর্মা হ'য়ে তরোয়াল উঁচিয়ে ধরেন ওদেরই মারবার জন্যে।

আর যায় কোথা, দুই ভাই দুটো লাঠি না নিয়ে মাষ্টারের পিঠে এমনই ঘা কতক বসিয়ে দিল যে মোটা লাঠিও কাঠির মতো ভেঙে দু' টুকরো হ'য়ে যায়। তারপর তাঁর হাত-পা দড়ি দিয়ে বেঁধে শুইয়ে রাখে। সে রাতে ভায়েরা আর বাড়ি যেতে পারে না।

সকাল হ'তেই ডাক্তার নিয়ে আসা হয়। ডাক্তার বিধান দেন মাষ্টারকে চুল্লীর সামনে খাটের ওপর শুইয়ে রাখতে। কেউ তাঁর সংগে কথা কইতে পাবে না। তিনি কথা বলতে চাইলেও জবাব যেন না দেয়া হয়। খাওয়া দাওয়া নামমাত্র দিতে হবে এ সময়টা, যতদিন না হারাণো বুদ্ধিশুদ্ধি ফিরে আসছে। এই বিধান অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলতে শুরু ক'রে দেওয়া হয়।

বোলোগ্না শহরের সবাই মাষ্টার মশায়ের অসুখের খবর শুনতে পেল। জানলো তাঁর মাথা খারাপ হ'য়ে গেছে। সবাই দুঃখ ক'রে বলাবলি করে নানান্-কথা।

শেষে কয়েকজন ছাত্র তাঁকে দেখতে আসে। বুসিয়োলোও এদের সংগ নেয়—সে তো মাষ্টার মশায়ের ব্যাপার জানে না কিছুই। তাঁকে তার অভিজ্ঞতার কথা বলতে না পেয়ে খুবই ক্ষুণ্ণ হ'য়ে র'য়েছে।

মাষ্টার মশায়ের বাড়ি পৌঁছে বুসিয়োলো তাজ্জব বনে যায়। এ কী ব্যাপার! এতক্ষণে বিষয়টা বুঝতে পারে সে, কেন মাষ্টার মশায়ের এমন অবস্থা। কিন্তু পাছে অপরে কিছু জানতে পারে সেই ভয়ে নিজেকে সামলে নিয়ে এক রকম টলতে টলতে সকলের সংগে মাষ্টারের ঘরে গিয়ে ঢোকে।

আষ্টেপিষ্টে দড়িবাঁধা হ'য়ে চুল্লীর ধারে খাটের ওপর পড়ে র'য়েছেন মাষ্টার। ছাত্রেরা সবাই তাঁকে সমবেদনা জানায়। চুপ ক'রে থাকা ভালো দেখায় না ঠিক ক'রে বুসিয়োলো এগিয়ে এসে বলে: মাষ্টার মশাই, আপনি আমার পিতৃতুল্য, আপনার এ অবস্থার জন্যে আমি ভীষণ দুঃখিত। আমার যদি কিছু ক'রবার থাকে দয়া ক'রে আদেশ করুন, ছাত্রজ্ঞানে একটুয়ো দ্বিধা ক'রবেন না।

মাষ্টার মশাই তখন বললেন: বুসিয়োলো, এবার তুমি এখান থেকে যেতে পারো। যে বিদ্যা শিখতে চেয়েছিলে তা খুব ভালো করেই রপ্ত ক'রে নিয়েছো। শুধু তাই নয়, সেটা আমার ঘাড়ের ওপর দিয়েই সমাধা ক'রলো। এখন এসো।

ম্যাডোনা গিয়োভানো একথা শুনতে পেয়ে চেঁচিয়ে ওঠে: শুনো না, শুনো না, ওর কথা কানে নিয়ো না; কি যে মাথামুণ্ডু বলছে তা কী ছাই ও বুঝতে পারছে।

বুসিয়োলো ওখান থেকে সোজা পিয়েত্রো পায়োলোর কাছে হাজির হয়। বলে: ভাই, বোলোগ্নায় তুমি একা থেকেই পড়াশুনো এবার শেষ করো। সত্যি কথা বলতে কি, আমার এতো কিছু শেখা হ'য়েছে যে শেখবার বাসনা আর আমার নেই!

এর পর বুসিয়োলো ভালোয় ভালোয় রোমে ফিরে আসে।

প্রেমের পাঠ

মনকোঁতুরের সামন্ত তুরের বিখ্যাত সৈনিক ছিলেন। আঁজুর ডিউকের হোয়ে তিনি লড়াই করেন। যুদ্ধে আঁজুর জিৎ হওয়ার পর এই যুদ্ধের স্মৃতিচিহ্ন হিসাবে মনকোঁতুর তাঁর প্রাসাদের নামকরণ করেন ঐ যুদ্ধের নামে। আমাদের এই সামন্তটির দুটি ছেলে ছিল। বড় ছেলেটি ছিল গোঁড়া ক্যাথলিক। রাজার অত্যন্ত প্রিয়পাত্র ছিল সে। সেণ্ট বার্থলোমিউএর সন্ধির পর সামন্ত বাড়ি ফিরলেন। বাড়ি ফিরে তিনি শুনলেন বড় ছেলেটি ভিলেকারের জমিদারের সঙ্গে দ্বন্দ্ব যুদ্ধে মারা গেছে। খবরটা পেয়ে তিনি একেবারে মুষড়ে পড়লেন। ছেলেটির ওপর তাঁর অনেক আশা ছিল। আঁবয় বংশের একটি মেয়ের সঙ্গে তিনি ওর বিয়ের ব্যবস্থা পাকা ক'রে রেখেছিলেন। তাঁর আশা ছিল একদিন তাঁর বংশ ফ্রান্সের শ্রেষ্ঠ সম্ভ্রান্ত পরিবার গুলির অন্যতম হোয়ে উঠবে। এই আশা নিয়েই তিনি অন্য ছেলেটিকে মঠে একজন সুবিখ্যাত ধার্মিক লোকের তত্ত্বাবধানে রেখে শিক্ষা দিচ্ছিলেন। ভবিষ্যতে সে একজন বিখ্যাত কার্ডিনাল হয় এই ছিল তাঁর মনের বাসনা। তাঁর মনের কথা

জানতে পেরে সেই মঠের মোহান্ত মহারাজ ছেলেটিকে সব সময় নিজের কাছে রেখে শিক্ষা দিতেন। মহারাজের বাড়িতে ছেলেটি থাকত। রাত্রে শুতো মহারাজের শোবার ঘরের পাশের ছোট কুঠরীতে। অসৎ সংসর্গ এবং অসৎ চিন্তা থেকে তিনি ছেলেটিকে সব সময় আগলে রাখতেন। ফলে উনিশ বছর বয়স হওয়া সত্ত্বেও সে ভগবৎপ্রেম ছাড়া আর কোনো প্রেমের খবরই জানত' না। চরিত্র বলতে সে বুঝত দেবদূতের চরিত্র, সে চরিত্রে দেহজ কোনো কিছুরই স্থান নেই। দেবদূতদের নাকি কোনো রকম দেহজ আবেদন থাকে না। থাকে না বলেই রক্ষে না হ'লে তারাও নিশ্চয় দেহের সদ্ব্যবহারই কোরত। দেহজ প্রবৃত্তিগুলোকে ভগবানও ভয় করেন—তাই তিনি তাঁর চাকরদের ও থেকে সম্পূর্ণভাবেই বঞ্চিত কোরে দিয়েছেন। তা যদি না কোরতেন তা'হলে বিপদের অন্ত থাকত না। ওরা তো আর আমাদের মত মদের দোকানে অথবা গণিকালয়ে গিয়ে হুল্লোড় কোরতে পারত না। কিন্তু তাঁর কথাই আলাদা তিনি হোলেন জগতের অধিপতি। আমাদের মনকৌতুরের অধিপতি কিন্তু বিপদে পড়ে ছোট ছেলেটিকে মঠ থেকে সরিয়ে নিলেন। কার্ডিনাল করার চেষ্টা ছেড়ে ওকে তিনি সৈনিক ক'রে তোলার চেষ্টায় উঠে পড়ে লাগলেন। বড় ছেলের বাগদত্ত মেয়েটির সঙ্গে তিনি ওর বিয়ে দেবেন ঠিক ক'রলেন। মেয়েটির

পক্ষে অবশ্য এটা ভালই হোলো, কারণ বড় ছেলেটি রাজপরিবারের মেয়েদের পাল্লায় পড়ে গোল্লায় যাবার উপক্রম ক'রছিল। ছোট ছেলেটি অত্যন্ত ভিতু প্রকৃতির। কাজেই বাপের আদেশকে পবিত্র অনুজ্ঞা বলে সে মেনে নিল এবং সহজেই বিয়েতে রাজী হোয়ে গেল। কিন্তু বিয়েতে রাজী হোলেও বিয়ের অর্থ কি তা তার জানা ছিল না—এমন কি মেয়ে বলতে কি বুঝায় তাও সে জানত না। প্রকৃত পক্ষে তার অজ্ঞতার সীমা ছিল না। এতখানি অজ্ঞতাকে আইনের দিক থেকে বোধ হয় অপরাধও বলা যেতে পারে। যাই হোক, দৈবক্রমে, ও যেদিন মনকোঁতুরের প্রাসাদে এসে পৌঁছুল, তার পরের দিনই ওর বিয়ে। সৈনিকদের যাতায়াতের জন্য পথে ও আটকা পড়ে গিয়েছিল। তুরের আর্চবিশপের পৌরোহিত্যে ওদের বিয়ে হোয়ে গেল। এখানে ক'নের একটু বর্ণনা দেওয়া দরকার। ওর মা বহুকাল থেকেই বিধবা। তিনি শ্যাটেল হু প্যারিসের নাগরিক বাহিনীর সেনাধক্ষ্য মঁসিয়ে হ্য ব্রেগলোনের বাড়িতে বাস কোরতেন। ব্রেগলোনের স্ত্রী নাকি লিগনিয়ারের জমিদারের সঙ্গে থাকতেন। একথা সকলেই জানত কুৎসাও ছিল তার খুবই। তবে সে সময়ে পরের ব্যাপার নিয়ে লোকে খুব বেশী মাথা ঘামাত না। কারণ প্রবচনের 'ছুঁচ আর চালুনির' মত ছিল সকলেরই অবস্থা। প্রত্যেকেই তখন

মজা লুটে বেড়াত কাজেই প্রতিবেশীর খবর রাখার সময় এবং সাহস কোনোটাই কারো ছিল না। দুর্নীতিটাই তখন রেওয়াজ হোয়ে উঠেছিল। সততা জিনিষটা এখানে ওখানে দু'একটি মহিলা ছাড়া বোধহয় সারা ফ্রান্সের কোনখানে মিলত না।

আঁবয়দের বাড়িতে সমণ্টের বিধবা গিন্নী বাস কোরতেন। প্রকৃত ধর্মপরায়ণা বলতে যা বোঝায় তিনি ছিলেন তাই। আমাদের গল্পের নায়িকাটির বয়স যখন দশ, তখন থেকে তিনি তাকে বুকে কোরে মানুষ ক'রেছেন। মেয়ের মা মাদাম আঁবয় ওঁকে তাঁর হাতে সঁপে দিয়ে নিশ্চিন্ত হোয়ে বাইরে বাইরে ঘুরে বেড়াতেন। বছরে একবার-মাত্র তিনি বাড়ি আসতেন—সেই সময় দেখা হোতো মেয়ের সঙ্গে। যাই হোক মেয়ের বিয়েতে যথানিয়মে তাঁকে নিমন্ত্রণ করা হোলো। ব্রেগলোনের জমিদারকেও নিমন্ত্রণ করা হোলো। ওঁরা সকলেই এলেন। আসতে পারলেন না শুধু সমণ্টের বিধবা গিন্নী। সাইটিকা রোগে তখন তিনি শয্যাশায়ী। তাঁর এতবড় আনন্দের অনুষ্ঠানে উপস্থিত হোতে না পারায় বেচারী চোখের-জলে ভাসতে লাগলেন। মেয়েটির জন্য মনে মনে তাঁর ভয়ের সীমা ছিল না। ওঁকে তিনি যেভাবে মানুষ কোরেছেন তাতে ও এই জীবনের সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে পারবে কিনা এসম্বন্ধে তাঁর যথেষ্ট সন্দেহ ছিল। কিন্তু উপায়

তো কিছু নেই কাজেই তাঁকে চুপ কোরেই থাকতে হোলো। তবে তিনি শুনেছিলেন যে যার সঙ্গে মেয়ের বিয়ে হ'চ্ছে সে প্রায় আধা-সন্ন্যাসী। এইটুকুই ছিল তাঁর স্বান্তনা। মোহান্ত মহারাজের সঙ্গে তাঁর জানাশোনা ছিল। তাঁর কাছেই তিনি ছেলের সব খবর পেয়েছিলেন। যাই হোক, শেষ পর্যন্ত চোখের জলের মধ্যে তিনি ওকে বিদায় দিলেন। যাত্রা করার আগে তিনি বললেন: সবসময় তোমার স্বামীকে মেনে চলবে—শাশুড়ীকে শ্রদ্ধা-ভক্তি কোরবে।

বাজনা-বাদ্যি কোরে কনে এসে পৌঁছুল। তার সঙ্গে গেল সমণ্টদের বহু পাইক-বরকন্দাজ, দাসদাসী। বর-কনে দুজনেই বিয়ের আগে সন্ধ্যেবেলা এসে উপস্থিত হোলো। খাওয়া-দাওয়ার পর খুব ধুমধাম কোরে ওদের বিয়ে হোয়ে গেল। ব্লয়ের বিশপের প্রাসাদে ওদের মংগল কামনার একটা প্রার্থনা-সভা করা হ'ল। বিশপ ছিলেন মনকোঁতুরের বন্ধু। সকাল পর্যন্ত চলল আমোদ উৎসব। মধ্যরাত্রির ঘণ্টা বাজার সঙ্গে সঙ্গে কনের-ঝি কনেকে শোবার ঘরে শুইয়ে দিয়ে এল। তুরেঁদের নিয়ম: কনে ঘরে পৌঁছে দিয়ে বরকে আটকে রেখে হাসি-ঠাট্টা করা। মনকোঁতুর কিন্তু এসব ফাজলামি কোরতে দিলেন না। যথাসময়ে আমাদের আধাসন্ন্যাসী-বর ঘরে গিয়ে ঢুকল। সে তখন ভাবছে: বৌকে দেখতে নিশ্চয়ই ইতালীয় এবং ফ্লেমিশ চিত্রকরদের

আঁকা কুমারি-মেরীর ছবির চেয়েও সুন্দর হ'বে। কিন্তু হঠাৎ এই স্বামীত্বের গৌরবলাভ তাকে যথেষ্ট ভাবিয়ে তুলেছে। স্বামী হিসাবে ও'র করণীয় যে কি সে সম্বন্ধে ওর কোনো জ্ঞান নেই। বাপকে আবার ভরসা কোরে জিজ্ঞেস কোরতে গিয়েছিল। কিন্তু তিনি কড়াস্বরে উত্তর দিয়েছেন: "কি কোরতে হ'বে তুমি নিশ্চয়ই জান—ভয়ের কিছু নেই।"

ঘরে ঢুকে ও দেখল কনে দিব্বি আরামে চাদর-জড়িয়ে শুয়ে রয়েছে। মেয়েটি এদিকে তখন দারুণ কৌতূহল নিয়ে ও'কে দেখছে আর ভাবছে: "একে আমায় মেনে চলতে হ'বে।"

কিছু না জেনেই মনে মনে সে স্থির কোরে নিল তাঁর সন্ন্যাসী-স্বামী যা' বলবেন সে তাই কোরবে। আমাদের সিভালিয়ার দ্য-মনকৌতুর বিছানার কাছে দাঁড়িয়ে কান চুলকে তারপর হাঁটুগেড়ে বসে পড়ে জিজ্ঞেস কোরল: "তুমি প্রার্থনা কোরেছ?"

"না, ভুলে গেছি" —মেয়েটি বলল। "তুমি যদি বলো তো করি।"

তখন ওরা দুজনে প্রার্থনা ক'রতে বস্‌ল। নোতুন ঘর বাঁধতে যাচ্ছে ওরা। কাজেই এটাকে ভালই বলতে হ'বে। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে ওদের প্রার্থনা ভগবানের কানে না পৌঁছে শয়তানের কানে গিয়ে উঠল। ভগবান হয়তো বা তখন

কোনো ধর্ম্মসংস্কারের নোংরা ব্যাপার নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন।

"তোমাকে ওরা কি কোরতে বোলেছে?"—বর প্রশ্ন কোরল।

"তোমাকে ভালবাসতে"—ক'নে কিছু না জেনেই উত্তর দিল।

"আমাকে এসব কিছুই বলে দেওয়া হয়নি। কিন্তু তোমাকে দেখেই আমি ভালবেসে ফেলেছি। সত্যি কথা বলতে কি, ভগবানের চেয়েও বেশী ভালবেসে ফেলেছি।"

কনে কিন্তু একথায় একটুও ভয় পেল না।

"আমি তোমার বিছানায় একটু শুতে চাই—অবশ্য তোমার যদি অসুবিধে না হয়..." বর বলল।

"বেশ তো, আমি স'রে যাচ্ছি। আমি সব সময় তোমার কথামতই চলব।"

"বেশ তা'হলে এখন তুমি একটু অন্য দিকে মুখ ঘোরাও আমি জামা কাপড়গুলো ছেড়ে ফেলি।"

দারুণ একটা কৌতুহল নিয়ে কনে পিছন ফিরে শুল। ও'র সঙ্গে আর একজনের মাত্র একটা জামার ব্যবধান থাকবে এটা ভাবতেই ও'র যেন কেমন আশ্চর্য বোধ হোতে লাগল। বর এসে বিছানায় উঠল। কিন্তু এরপর ও'রা যে কি কোরল সে আপনি কল্পনাও কোরতে পারবেন না! যে বাঁদর জীবনে কখনো নারকোল ছাখেনি হঠাৎ তার হাতে দি একটা নারকোল দেওয়া যায় তো তার যা অবস্থা হয়

আমাদের বরেরও অবস্থা হোল তেমনি। নারকোলটা হাতে নিয়েই বাঁদর বোঝে যে এর মধ্যে আছে অতি উপাদেয় ভোজ্য। কিন্তু কেমন ক'রে যে তাকে ভোগে লাগান যায় তা আর সে ভেবে পায় না। কাজেই সেটাকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে, ঠুকে, গন্ধ শুকে সে শেষ পর্যন্ত হয়তো ফেলেই দেয়। আমাদের বরও সারারাত ধরে কনেকে নিয়ে দেখে, পরীক্ষা কোরে, গবেষণা কোরে নাজেহাল হোয়ে গিয়ে শেষ পর্যন্ত কনের কাছে স্বীকার কোরল—ও'কে কি কোরতে হবে তা ও জানেনা। কাজেই এ সম্বন্ধে ওকে ভাল কোরে জানতে হবে এবং সাহায্য নিতে হ'বে। কনেও ওঁকে সমর্থন কোরে বলল: "সেই ভাল। আমিও কিছুই জানি না যে তোমাকে শিখিয়ে নেব।"

নানা রকম চেষ্টা কোরেও বিফল হোয়ে শেষ পর্যন্ত ও'রা ঘুমিয়ে প'ড়ল। সকালে ঘুম থেকে উঠে বাইরে গিয়ে কনে সকলের কাছেই বরের প্রশংসা কোরতে লাগল। ও'র কথা শুনে অনেকেই ভাবল মেয়েটা অত্যন্ত নির্লজ্জ। রচিকর্বনের গিন্নির প্ররোচনায় একটি মেয়ে ওঁকে দ্ব্যর্থবোধকভাবে জিজ্ঞেস কোরল:

"তোমার কর্ত্তা কাল রাত্রে উনুনে ক'টা পাঁউরুটি সেঁকল, ভাই?"

"চব্বিশটা"—গম্ভীরভাবে ও উত্তর দিল।

বরও এদিকে মুখ শুকিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কি কোরে

যে ওঁর অজ্ঞতা যাবে ভেবে ভেবে বেচারা সারা হোয়ে যাচ্ছে। মেয়েরা কিন্তু ও'র শুক্‌নো চেহারার আর একরকম অর্থ ভেবে নিল। সকালের খানা খেতে খেতে ওঁরা এই সব নিয়ে নোংরা রসিকতা কোরতে আরম্ভ কোরল। তখনকার দিনে এই ধরনের অশ্লীল রসিকতার খুব প্রচলন ছিল। কিন্তু ও'দের এই সব ঠাট্টা বিদ্রুপ থেকে বর বেচারা কিছুই বুঝতে পারল না—উপরন্তু তা'র মাথা আরো যেন গুলিয়ে যেতে লাগল। রাত্রে ওঁরা কেউই ঘুমোয় নি—হৈ হুল্লোড় কোরে সারা রাত কাটিয়ে দিয়েছে।

এদিকে মেয়েকে নিয়ে এই সব রসিকতা শুনতে শুনতে লেডি আঁবোয়া নিজেও উত্তেজিত হোয়ে উঠছিলেন। সুযোগ বুঝে ব্রেগলোঁনকে তিনি ইশারায় মনের কথা জানাবার চেষ্টা কোরতে লাগলেন। ব্রেগলোঁন সব বুঝেও না বোঝার ভান কোরতে লাগলেন। মাদাম আঁবোয়ার প্রেমের জ্বালায় বেচারা নাজেহাল হোয়ে গিয়েছিলেন। কেবলমাত্র নীতি ধর্ম্মের দিকে চেয়েই তিনি এতদিন পর্যন্ত ও'কে ছেড়ে দেন নি।

বিয়ের পরদিন অতিথিরা অনেকেই চলে গেল। মাদাম আঁবোয়া রাত্রে খাওয়ার সময় আবার ব্রেগলোঁনকে ইশারা ক'রে মনের কথা জানালেন। খাওয়ার পরে ব্রেগলোঁন বসে বসে কনের সঙ্গে গল্প কোরতে লাগলেন। এদিকে মাদাম আঁবোয়া ক্রমেই অধীর হোয়ে বার বার তাঁকে ইশারা

কোরছেন। ইশারার ফল ফলল উল্টো রকম। ব্রেগলোঁনের বদলে বর বেরিয়ে এসে অাঁবোয়ার সঙ্গ নিল। অাঁবোয়া আর কি করেন অগত্যা ওঁকে নিয়ে তিনি বেড়াতে লাগলেন। এদিকে বরের মনে একটা আশা ক্রমেই জেগে উঠতে লাগল। সে মনে মনে ভাবল: এঁর কাছ থেকে ব্যাপারটা জেনে নিলে মন্দ হয়না। দ্বিধা-লজ্জায় জড়িয়ে ক্রমে ক্রমে সে তার বক্তব্যের দিকে এগুতে লাগল। প্রথমটা অাঁবোয়ার কানে কোনো কথাই গেল না। ব্রেগলোঁনের ওপর রাগে তখন তিনি জ্বলছেন। মনে মনে তিনি ব্রেগলোঁনের মুণ্ডপাত ক'রছেন। বর এদিকে বলতে বলতে ক্রমে উত্তেজিত হোয়ে উঠছে। এতক্ষণ পরে হঠাৎ জামাই এর কথাগুলো কানে যেতে তিনি চমকে গেলেন। মনে মনে তিনি ভাবলেন: "মন্দ কি, এ' বুড়ো হতভাগার চাইতে এই নোতুন ছোকরা ঢের ভালো।"

• এই কথা ভেবে গল্প কোরতে কোরতে ওঁকে তিনি বাগানে টেনে এনে বললেন: "আজ রাত্রে তুমি লুকিয়ে আমার ঘরে এসো—তোমাকে আমি তোমার বাবার চেয়েও অভিজ্ঞ কোরে ছেড়ে দেব।" বর খুশী হোয়ে মাদাম অাঁবোয়াকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানিয়ে বলল, "কিন্তু কারুকে বলবেন না।"

ওরা ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার পর ব্রেগলোঁনও কনের কাছে বসে মনে মনে মাদাম অাঁবোয়াকে নরকস্থ কোরতে লাগলেন। কনেরও তখন মাথায় একমাত্র চিন্তা কি কোরে

বিবাহিত দম্পতির করণীয় কাজগুলো জানা যায়। মনে মনে ও ভাবতে লাগল : যদি কোনো রকমে ওগুলো জেনে নিতে পারি তা'হলে রাত্রে বরকে শিখিয়ে দেব। ওর পালিকা সেই বিধবা ও'কে সব সময় বয়োবৃদ্ধদের শ্রদ্ধা ভক্তির চোখে দেখতে শিখিয়েছিলো। কাজেই ও ভাবল : ব্রেগলোঁনকেই জিজ্ঞেস কোরে সব জেনে নেওয়া যাক্।

ও'র প্রশ্নে এতক্ষণে ব্রেগলোঁনের চমক্ ভাঙল। তিনি জিজ্ঞেস করলেন :

"অমন তরুণ স্বামীকে নিয়ে কি তুমি সুখী নও ?"

"না, না, তা নয়। ও খুব ভাল লোক।"

"অতিরিক্ত ভালো বোধ হয়"—ব্রেগলোঁন বাঁকা হাসি হেসে বললেন। শেষ পর্যন্ত ব্রেগলোঁনের সঙ্গে ওর কথা হোয়ে গেল—রাত্রে কনে সুযোগ কোরে ব্রেগলোঁনের ঘরে আসবে—তিনি ওকে সানন্দে অভিজ্ঞতা দান কোরবেন। রাত্রে খাওয়া দাওয়ার পর ব্রেগলোঁনের সঙ্গে মাদাম আঁবোয়ার দারুণ একচোট ঝগড়া হোয়ে গেল। আঁবোয়া বললেন : তুমি অত্যন্ত অকৃতজ্ঞ তাই আমার কাছে কত পেয়েছ সব আজ ভুলে গেছ। এর আগেও ওদের বহুবার ঝগড়া হোয়েছে—কিন্তু এতদিন সবই ঢাকা দেওয়া ছিল।

এদিকে রাত্রে শুয়ে বর কনে দুজনেই ভাবতে লাগল কি ছুতো কোরে ঘর থেকে বাইরে যাওয়া যায়। বর শেষ পর্যন্ত অসুস্থতার ভান কোরে বলল : আমি একটু খোলা

হাওয়ায় বেড়িয়ে আসি। কনেও তখনি রাজী হোয়ে ওকে চাঁদের আলোয় ঘুরে আসতে বলল। সুযোগ বুঝে তুজনেই বিছানা ছেড়ে বেরিয়ে পড়ল। গুরুর কাছে পাঠ নিতে যাবার জন্য তুজনেই তখন ব্যাকুল হোয়ে উঠেছে। পাঠ তারা ভালভাবেই পেল। তবে পদ্ধতিটার কথা আমি বলতে পারবো না, ওটা এক একজনের এক এক রকম। সমস্ত রকম বিজ্ঞানের মধ্যে এই বিজ্ঞানটি-তে নানারকমের বৈচিত্র আছে এবং ছাত্রছাত্রীদেরও সব রকম বিষয়ের মধ্যে এই বিষয়টাতে সবচেয়ে বেশি আগ্রহ। যাই হোক ঘরে গিয়ে ওরা অনুশীলনী শুরু কোরলে, তুজনেই পরস্পরের ওপর অত্যন্ত খুশী হোয়ে উঠল। কনে এমন কি বলেই ফেলল ঃ "ওঃ! তুমি দেখছি এরই মধ্যে আমার গুরুর চেয়েও বেশী শিখে ফেলেছ।"

এরপর থেকে ওদের দাম্পত্য জীবন হোয়ে উঠল অত্যন্ত সুখের। পরিপূর্ণ বিশ্বাস এবং আনন্দ নিয়ে ওরা সংসার কোরতে লাগল। তুজনের নিবিড় অভিজ্ঞতায় তুজনেই হ'য়ে উঠল খুশী। বাকী জীবনটা ওদের এমনি ভাবে সুখেই কেটে গেল। মনকৌতুরের বৃদ্ধ জমিদার অর্থাৎ আমাদের অনভিজ্ঞ বরকে তাই তার শেষ জীবনে তাঁর বন্ধুবান্ধবদের কাছে বলতে শোনা যেত ঃ

"বাইরে থেকে অসতী নারীর স্পর্শলাভ না ক'রে, অসতী নারী নিয়ে ঘর করা অনেক ভালো।"

"রাজার-প্রিয়া"

পণ্ট-অ-চেঞ্জাওটা যেখানে সামনের দিকে এগিয়ে গিয়েছে সেইখানে একজন স্যাক্‌রা বাস ক'রতো। এই স্যাক্‌রার একটি মেয়ে ছিল। সারা প্যারিস জুড়ে ছিল মেয়েটির রূপের খ্যাতি। তার সংগে প্রেম করার জন্যে অনেকেই অনেক রকম চেষ্টা ক'রতো। আবার অনেকে ওকে বিয়ে করার জন্যে ওর বাবাকে প্রচুর টাকাকড়ি দেবারও লোভ দেখাত। ওর বাবা,—সেই স্যাক্‌রা এতে মনে মনে খুবই খুশি হোতো।

ওদের প্রতিবেশী ছিলো একজন মস্ত বড় উকিল। সে লোককে কুপরামর্শ দিয়ে প্রচুর রোজগার ক'রত। তাঁ'র অনেক বিষয়-সম্পত্তি ছিলো। মেয়েটিকে লাভ করার জন্য সেও অত্যন্ত ব্যাকুল হোয়ে উঠল। শেষ পর্যন্ত সেও স্যাক্‌রার দারস্থ হোলো। বললো: আমার সংগে যদি তোমার মেয়ের বিয়ে দাও তাহ'লে তোমাকে আমি একটা আস্ত জমিদারি দিয়ে দেব। স্যাক্‌রা রাজী হ'য়ে গেল। সে ভেবে দেখলো জামাই যদিও বুড়ো এবং দেখতেও মর্কটের মত কিন্তু তবু এমন সুযোগ ছাড়া উচিত নয়। টাকার লোভে সে এমনি মত্ত হোয়ে উঠল

যে ও'র মুখের দুর্গন্ধটাও তা'র নাকে পৌঁছুল না। স্যাক্‌রা লোকটা নিজেও ছিল অত্যন্ত নোংরা। অবশ্য এই শ্রেণীর লোকেরা স্বভাবতই নোংরা হোয়ে ওঠে—ওদের কলের ধোঁয়ার মধ্যে হ'লদে পার্চমেণ্ট কাগজে-মোড়া ঘুপসি ঘরে বাস ক'রতে হয়। তা'ছাড়া আনুষঙ্গিক অনেক রকম নোংরামিও ওদের জীবনে এসে পড়ে। তাহ'লেও ওর হবু জামাইয়ের নোংরামিটা যে ও'র চোখ এড়িয়ে গেল তার কারণ ও'র টাকার লোভ। কিন্তু ওর মেয়ে ভাবী স্বামীকে দেখে একেবারে আঁত্‌কে উঠলো। বললো: "না, ওর সঙ্গে আমি কিছুতেই ঘর ক'রতে পারবো না।"

ওর বাবার চোখে তখন জমিদারির স্বপ্ন ভাসছে। সে বলল: "সে'টা আমার দেখার কথা নয়, আমি তোমাকে উপযুক্ত বর দেখে বিয়ে দিয়েই খালাশ। এবার তোমরা পরস্পরের সঙ্গে বনিবনা ক'রে নাও। কি ক'রলে বা কেমন ভাবে বললে তোমার ওকে পছন্দ হবে, সেটা বুঝে নেবার দায়িত্ব ওর।"

"তাই না কি? আচ্ছা বেশ, তোমার হুকুম মত ওকে বিয়ে করার আগেই আমি ওকে জানিয়ে দেব আমার কাছে ও কি পাবে"—মেয়ে উত্তর দিল।

সেদিন সন্ধ্যেবেলা খাওয়া-দাওয়ার পর বিয়ে-পাগলা বুড়ো মেয়েটির কাছে উপস্থিত হোলো। এসেই সে যে

ওকে কত ভালবাসে এবং বিয়ে ক'রে ওকে কত সুখে রাখবে তার ফিরিস্তি দিতে আরম্ভ করলো। মেয়েটি ওর কোনো কথা না শুনেই ও'কে থামিয়ে দিয়ে বললো: "দেখ, আমার বাবা আমাকে তোমার কাছে বিক্রী ক'রতে চাইছে। কিনলে তুমি কিন্তু ঠক্‌বে। কারণ তোমার সঙ্গে ঘর করার আগে আমি রাস্তার যে কোনো লোকের সঙ্গে পালিয়ে যাব। তোমার সঙ্গে আমি বিশ্বাসঘাতকতা করবোই—আর আমাদের দুজনের মধ্যে একজনের যতদিন না মরণ হ'বে ততদিন পর্যন্ত বিশ্বাসঘাতকতা আমি চালিয়ে যাব—এ আমি দিব্বি ক'রে বল্‌ছি।"

কথাটা শেষ ক'রেই ও কাঁদতে শুরু করল। জীবন সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা না থাক্‌লে মেয়েরা এমনিভাবেই কাঁদে—তারপর যখন সেই অভিজ্ঞতা আসে তখন চোখের জল যায় শুকিয়ে।

ওর এই অদ্ভুত ব্যবহারটাকে উকিলমশাই কিন্তু অন্যভাবে নিল। সে ভাবল ওটা স্বাভাবিক মেয়েলি ছলাকলা ছাড়া আর কিছুই নয়। মেয়েরা এমনিভাবেই তাদের প্রণয়ীর প্রণয়তৃষ্ণা বাড়িয়ে তোলে। পুরুষের আদর-আবদার করা অথবা স্বামীকে তার দাবী দাখিল ক'রবার এটা ছলমাত্র। কাজেই বদমায়েস বুড়ো ওর আপত্তিগুলো আমলেই না এনে বিয়ের দিনটা নির্দ্দিষ্ট করার জন্য ওকে অনুরোধ ক'রতে লাগল।

তা'র অনুরোধের উত্তরে ও বললো : "বেশ তো, কালই বিয়ে হোয়ে যাক্। যত তাড়াতাড়ি হয় ততই ভালো—আমিও তত তাড়াতাড়িই পর-পুরুষ নিয়ে মজা ক'রে জীবন কাটাবার স্বাধীনতা পাব।"

বুড়ো-উকিলের তখন 'গুড়ের কলসীর মাছির' মত অবস্থা। সে বিয়ের ব্যবস্থা করার জন্যে ব্যস্ত হোয়ে দৌড়োদৌড়ি শুরু কোরে দিলো। তাড়াহুড়ো ক'রে জিনিষপত্র কেনাকাটা ক'রতে লেগে গেল। রাজবাড়িতে, আদালতে সকলকে নিমন্ত্রণ কোরে এল। ঠিক এইসময় রাজা বাইরে থেকে ঘুরে দেশে ফিরেছেন। দেশে ফিরে অবধি তিনি স্যাক্‌রার মেয়ের রূপের-ব্যাখ্যা শুনছেন। স্যাক্‌রার মেয়ে কা'র হাজার ক্রাউন প্রত্যাখ্যান ক'রেছে, কাকে দাবড়ানি দিয়ে দূর ক'রে দিয়েছে—এইসব শুনতে শুনতে তাঁর কানে তালা লাগবার দাখিল। শহরের সেরা ছেলেরাও ওর কাছে নাকি পাত্তা পায়নি।

এই ধরনের খেলায় রাজা ছিলেন অতিরিক্ত উৎসাহী। কাজেই আর সময় নষ্ট না ক'রে তিনি বেরিয়ে পড়লেন এবং প্রিয়ার জন্য হীরে-জহরৎ কেনার ছুতোয় স্যাক্‌রার দোকানে এসে হাজির হ'লেন। মনে মনে তাঁর আসল উদ্দেশ্য শহরের 'শ্রেষ্ঠ জহরৎ'টিকে স্বচক্ষে দেখা। দোকানে ঢুকে যত জহরৎই দেখেন কোনোটাই তাঁর আর পছন্দ হয় না। তখন স্যাক্‌রা একটা মস্ত

বড় সাদা হীরে দেখাবার জন্যে গুপ্ত দেরাজ খুলে খুঁজতে লাগলো। সেই সুযোগে রাজা মেয়েটিকে বললেন: "দেখ সুন্দরী, এইসব দামি পাথর গ্রহণ করাই তোমার কাজ—বিক্রী করা নয়। এখানকার সমস্ত হীরে-জহরতের মধ্যে একটিমাত্র অমূল্য জহরৎ আমার পছন্দ হ'য়েছে। সারা দেশটাই একটিমাত্র জহরতের জন্যে ক্ষেপে উঠেছে। তার কাছে ক্রীতদাস হোয়ে থাকতে পারলে আমি নিজেকে ধন্য মনে করবো। আর মূল্যের কথা বল তো বলি: গোটা ফ্রান্সের রাজত্বটা দিলেও তা'র উপযুক্ত মূল্য দেওয়া হবে না।"

মেয়েটি বললে: "দেখুন, কাল আমার বিয়ে। কিন্তু আপনার কোমরে যে ছোরাটি র'য়েছে ওটি যদি আমাকে ধার দেন তা'হলে কাল আমি নিজের সম্মান রক্ষা কোরতে পারি। তারপর আপনার জহরৎ আপনিই পাবেন।"

রাজা তখনই কোমরবন্ধ থেকে ছোট্ট ছোরাটি খুলে দিলেন। ওর সাহসিকতা ভরা কথাগুলি তাঁর এত ভাল লাগল যে আনন্দে তাঁর যেন ক্ষুধাতৃষ্ণা লোপ পেয়ে গেল। তিনি তখনই তাঁর নতুন প্রণয়িনীর জন্যে রু দ্য লা হিরুণদলের ওপর একটা প্রাসাদের বন্দোবস্ত ক'রে ফেললেন।

এদিকে আমাদের উকিল মশাই তাড়াতাড়ি ক'রে

বিয়ের সব ব্যবস্থা ক'রে ফেলল। মেয়েটির প্রেমাকাঙ্খির দল মনঃক্ষুণ্ণ হ'য়ে ফিরে গেল। বিয়ের অনুষ্ঠানগুলো চুকে যাবার পর সন্ধ্যাবেলা বলনাচের আসর ভেঙে গেলে সে বাসর ঘরে ঢুকল। কিন্তু ঘরে ফিরে দেখল তার সুন্দরী বৌ ক্ষেপে আগুন হ'য়ে একটা আরাম কেদারায় বসে আছে। বৌএর মূর্তি দেখে সে ভিরমী যাবার দাখিল। ওর সৌন্দর্য যেন কোথায় উড়ে গিয়েছে। একেবারে শয়তানীর মত ভয়ংকর দেখাচ্ছে ওকে। কিছুতেই ও সেই আরাম কেদারা ছেড়ে তার পালংকের ওপর এল না। উকিলও সহজে ছাড়বার পাত্র নয়। সে ওর পায়ের কাছে হাঁটু গেড়ে বসে অনুনয় বিনয় ক'রতে লাগল। আস্তে আস্তে সে ওর জামায় হাত দিয়ে পোষাক খুলে নেবার চেষ্টা ক'রতে লাগলো। কিন্তু জামায় হাত দেবা মাত্র ও উকিলের গালে দিলো প্রচণ্ড এক চড় কষিয়ে। চড়ের চোটে বেচারা বুড়োর হাড়গুলো শুদ্ধ যেন মড়মড় ক'রে উঠলো। যন্ত্রণায় তার আনন্দ উবে যাবার যোগাড়। কিন্তু তবুও সে ছেড়ে না দিয়ে আবার চেষ্টা ক'রতে শুরু ক'রলো। কিছুক্ষণ ধস্তাধস্তি কোরে ওর জামা, অন্তর্বাস ছিঁড়ে খুঁড়ে যেই ও'কে আলিঙ্গন ক'রতে গেছে অমনি ও কোমর থেকে রাজার ছোরাটা বার ক'রে লাফিয়ে উঠে বললে: "কি চাও তুমি আমার কাছে?"

"সব কিছুই"—উত্তর দিলো উকিল।

"ইচ্ছের বিরুদ্ধে নিজেকে তোমার হাতে বিলিয়ে দেব এত বোকা আমি নই। আত্মরক্ষার ব্যবস্থা না ক'রেই আমি এখানে এসেছি, তুমি যদি একথা ভেবে থাক তো ভুল ক'রেছ। এই ছোরাটা দেখে রাখ, এটা রাজার ছোরা। আর এক পা আমার দিকে এগিয়েছ কি মরেছ!"

এই না বলে ও এক টুক্‌রো পোড়া কয়লা তুলে নিয়ে মেঝেতে নিজের চারপাশে একটা গণ্ডী কেটে দিয়ে বললো: "এটা রাজার জমিদারি—খবরদার এখানে পা দিও না!"

ছোরা দেখে বেচারা উকিল বোকা বনে গেল। ওর কথা-গুলো ছুরির ফলার মত তার বুকের মধ্যে বিঁধতে লাগলো। কিন্তু ছেঁড়া পোষাকের মধ্যে দিয়ে ওর ধব্‌ধবে সাদা গোলগাল উরু দুটি এবং অন্য সব অংগগুলো দেখতে পেয়ে সে এমনি উন্মত্ত হোয়ে উঠলো যে, মৃত্যুও যেন তার কাছে তুচ্ছ মনে হোতে লাগল। ধৈর্য ধরতে না পেরে সে সেই গণ্ডীর মধ্যে দৌড়ে গিয়ে বলল, "মরণকে আমি পরোয়া করিনা।"

তার দেহের ধাক্কায় মেয়েটি মেঝেতে পড়ে গেল। কিন্তু পড়ে গিয়েও প্রাণপণে তাকে ঠেকাতে লাগল। উকিল ওর কাছ থেকে ধাক্কা ছাড়া আর বিশেষ কিছুই উপভোগ ক'রতে পারল না। লাভের মধ্যে সে ওর হাতের ছুরির একটা মৃদুমন্দ খোঁচা খেল। পাগলের মত সে চেঁচিয়ে উঠল: "তোমাকে না পেলে আমি বাঁচব না···মেরে ফেল, আমাকে তুমি মেরে ফেল।···"

আবার সে ও'কে আক্রমণ ক'রল। ওর মাথায় তখন কিন্তু একমাত্র রাজার চিন্তা, কাজেই উকিলের এই প্রেম নিবেদন ওর মনে একটু আঁচড়ও কাটতে পারল না। নিরুপায় হোয়ে বললো: "দেখ, আবার যদি তুমি এমনি করো তাহ'লে তোমাকে না মেরে আমি নিজেই আত্মহত্যা কোরব।"

ও'র মূর্ত্তি দেখে বেচারা উকিল এবার সত্যি ভয় পেয়ে গেল। সে নিজের দূরদৃষ্টের ওপর অভিশাপ বর্ষণ কোরতে লাগল। আমোদ আহ্লাদের বদলে রাত্তিরটা কান্নাকাটিতে কেটে গেল। ওকে সে অনেক লোভ দেখাল। বললো: "আমি তোমাকে ঐশ্বর্য্যের মধ্যে ডুবিয়ে রাখব। তোমাকে বাড়ি ক'রে দেব, জমি কিনে দেব।"

কিন্তু কোনো ফলই হোলো না। শেষ পর্যন্ত সে বলল: "মাত্র এক রাত্তিরের জন্য তুমি আমার শয্যাসঙ্গিনী হ'ও—তারপর আর কোনদিন আমি তোমাকে বিরক্ত কোরব না। তোমার যেমন ইচ্ছে তেমনি ভাবে তুমি জীবন যাপন কোরো—আমি বাধা দেব না।"

কিন্তু তবুও ও রাজী হোলো না। বলল: "একমাত্র তোমার মরণ হোলেই আমি খুশি হব। আমি তো তোমাকে ঠকাই নি। আমি আগেই দিব্বি কোরেছিলাম যে রাস্তার যে কোনো লোকের সঙ্গে আমি পালিয়ে যাব—তার জায়গায় আমি যে রাজার কাছে দেহদান ক'রছি সে তো অনেক ভালো।"

দিনের আলো ফুটতেই বিয়ের ক'নের পোষাক পরে সে তৈরী হোয়ে নিল। উকিল যতক্ষণ রইল ততক্ষণ অবিশ্যি ধৈর্য ধরে চুপচাপ বসে রইল। তারপর উকিল বেরিয়ে যেতেই ও বেরিয়ে পড়ল রাজার সন্ধানে। ওকে বেশী পথ যেতে হোলো না। একটু দূরেই রাজার চাকর ওর জন্যে অপেক্ষা ক'রছিলো। ওকে দেখতে পেয়ে সে জিজ্ঞেস করল, "আপনি কি রাজাকে খুঁজছেন ?"

—"হ্যাঁ।"

"বেশ, আমাকে তাহ'লে আপনি বন্ধু বলে গ্রহণ ক'রতে পারেন। এখন আমি আপনাকে রক্ষা করার দায়িত্ব নিচ্ছি—কিন্তু ভবিষ্যতে আমার কথা মনে রাখবেন"—সেই চতুর লোকটি বলল।

পথে যেতে যেতে চাকরটি ও'কে বল্‌ল রাজা কি ধরনের মানুষ। রাজার খেয়ালীপনার সীমা নেই। তিনি আজ যাকে অন্তরের সমস্ত প্রেম ঢেলে বরণ ক'রে নেন কালই তা'কে বিনা দ্বিধায় চিরদিনের জন্য ভাসিয়ে দিতে পারেন। অর্থাৎ তাঁকে ঠিক মত রাশ ধরে চালাতে না পারলেই বিপদ।

কথা কইতে কইতে তারা হোটেল হিরুনদলে এসে পৌঁছুলো। হোটেল দ্য লা হিরুনদলের এই প্রাসাদেই পরে মাদাম দ্য এসত্যাম্প বাস কোরতেন। এদিকে উকিল বেচারা ঘরে ফরে দেখল পাখি উড়ে গেছে। দারুণ

মনঃকষ্টে তার দিন কাটতে লাগল। বন্ধুবান্ধবেরাও সুযোগ পেয়ে ঠাট্টা বিদ্রূপে তাকে নাজেহাল ক'রে ছাড়ল। তাকে যত বিদ্রূপ শুন্‌তে হোলো ততখানি বোধ হয় কামপসতেলায় সেণ্ট জেক্‌সকেও শুনতে হয়নি। ওর বন্ধুরা ওকে বিদ্রূপ ক'রে বলতে লাগল: "অসতী নারীর স্পর্শে তোমাকে যে কলঙ্কিত হোতে হয়নি এটাই যথেষ্ট।"

এদিকে বিয়েটাও ও'দের বিচ্ছিন্ন হোলোনা। কারণ রাজা এক্ষেত্রে প্রতিদ্বন্দ্বী। অন্য কেউ হোলে অবশ্য নিশ্চয় বিবাহ বিচ্ছেদ হোয়ে যেত। যাই হোক্ অগত্যা সে বৌকে রাজার কাছে ছেড়ে দিয়ে চুপচাপ দিন কাটাতে লাগলো। মনকে সান্ত্বনা দিয়ে ভাবল ভবিষ্যতে যদি একটি রাতের জন্যেও ওকে পায় তাহ'লে সারা-জীবনের দুঃখের মূল্য উঠে যাবে। একথা আমাদের স্বীকার ক'রতেই হ'বে যে, ভালবাসা একেই বলে। কিন্তু জগতে এমন একনিষ্ঠ ভালবাসা প্রায়ই বিদ্রূপ ছাড়া আর কিছুই পায় না। মেয়েটার কথা ভাবতে ভাবতে ক্রমে সে কাজে অবহেলা ক'রতে লাগলো। তার আচার ব্যবহারও গেল পাল্টে। শেষ পর্যন্ত ওকালতী করা একেবারেই ছেড়ে দিল। এদিকে সেই মেয়েটি রাজার প্রেমে ডুবে দিন কাটাতে লাগল। ও'র ছলাকলায় রাজা এমনি বশীভূত হোয়ে পড়লেন যে একমুহূর্তের জন্যেও তিনি তাকে ছেড়ে কোথাও যেতেন না।

সে-ও রাজাকে কখনো দূরে ঠেলে কখনো বা আদর কোরে কাছে টেনে একেবারে আঁচলে বেঁধে ফেলল।

ত্রিদোরের একজন জমিদার তো ওর জন্যে আত্মহত্যাই কোরে বসল। ওকে একবার মাত্র পাওয়ার প্রতিদান হিসাবে সে ওকে তুরেঁর জমিদারিটাই দান ক'রতে চেয়েছিল। কিন্তু তবু ও রাজী হোলো না। তুরেঁর এই প্রেমিক জমিদার-বংশ অবশ্য এখন একেবারে বিলুপ্ত হ'য়ে গিয়েছে। যাই হোক, যাঁর কাছে ও এই কাহিনীটা বল্‌লে তিনি ওকে দোষারোপ ক'রে বললেন : "তাহ'লে তার মৃত্যুর জন্যে তুমিই দায়ী।

এতে ওর মনটা অত্যন্ত খারাপ হোয়ে গেল। ও ঠিক ক'রল ভবিষ্যতে এমন ভাবে ও আর কারুকে ফেরাবে না, সামান্য একটা কাজ ক'রে যদি কারো প্রাণ বাঁচান যায় তাহ'লে তাতে আপত্তি করা উচিৎ নয়। এই সিদ্ধান্তে আসার ফলে ক্রমে ওর সম্পত্তি প্রচুর পরিমাণে বাড়তে আরম্ভ ক'রল। রাজাকে ও নানারকম গল্প বলে ভুলিয়ে রাখল। তিনি এ সবের কিছুই জানতে পারলেন না। রাজা ওকে অত্যন্ত বিশ্বাস ক'রতেন। ও যদি বলতো জল উঁচু দিকে ওঠে রাজা তাও বিশ্বাস ক'রে নিতেন। ওর কাছেই রাজার সারাদিন কেটে যেত কিন্তু সব জিনিষের মত প্রেমের সামগ্রীরও যে ক্ষয় আছে এটা তিনি বুঝতেন না। প্রকৃতির নিয়ম অনুযায়ী এ ক্ষেত্রেও ক্ষয় এলো—তবে সেটা

ওর নয়—রাজার নিজেরই। অতিরিক্ত প্রেমের ফলে প্রেম ক্রমশঃ বিস্বাদ হ'য়ে এল। এ দিকে ওর শত্রুপক্ষ ওর নামে মিথ্যা কলঙ্ক রটনা শুরু কোরল। তারা প্রচার করলো মাত্র দশ হাজার ক্রাউন ব্যয় ক'রলেই রাজা যে আনন্দে মশগুল হোয়ে আছেন সেই আনন্দ উপভোগ করা সম্ভব। কথাটা কিন্তু মিথ্যা। কারণ প্রকৃতপক্ষে রাজার পরিষদরা ছাড়া আর কেউই ওর কাছে আমল পেত না। যাই হোক, ওদের রটনা ক্রমে রাজার কানেও পৌঁছুলো। তিনি কথাটা বলতেই ও রেগে আগুন হ'য়ে বললো: "কোন্ মিথ্যাবাদী তোমার কানে এ মন্ত্র দিচ্ছে? ত্রিশহাজার ক্রাউনের কম খরচ ক'রতে পারে এমন কোনো লোককে আমি আজ পর্যন্ত আমল দিইনি।"

রাজা মনে মনে অত্যন্ত বিরক্ত হ'লেও না হেসে পারলেন না। মাস খানেক তিনি কলঙ্কটা থামাবার জন্য চুপচাপ রইলেন। মামজেল পিসেলো শেষ পর্যন্ত ওর সর্বনাশ ক'রে দিল। পিসেলো নিজে ওর জায়গাটা অধিকার করার জন্যে উৎসুক ছিল। অবশ্য ওর মত সর্বনাশ অনেকেরই কাম্য। কারণ এর আগে একজন তরুণ জমিদারের সঙ্গে ও সুখেই জীবন কাটিয়ে গেছে। যাক, যা বলছিলাম তাই বলি। একদিন ও পালকি কোরে চলেছে জামা কাপড় আর প্রসাধনের জিনিষ পত্র কিনতে। পালকির ধারে বসে বসে পা দোলাচ্ছে, পথের লোকজন হাঁ করে ওর দিকে

তাকিয়ে আছে। বিশেষতঃ কেরানীগুলো এমন ভাবে ওর দিকে তাকাচ্ছে যেন ও স্বর্গের অপ্সরী। এমন সময় হঠাৎ পথের মধ্যে বিষধর সাপ দেখলে লোকে যেমন চমকে ওঠে ও তেমনি চমকে উঠল। মসিয়ে দ্য ল্যানয় ওর সঙ্গে ছিলেন। তিনি আশ্চর্য হ'য়ে জিজ্ঞেস ক'রলেন: "কি ব্যাপার?"

"তেমন কিছুনা"—ও চুপিচুপি বললো: "ঐ যে লোকটি যাচ্ছে ও আমার স্বামী। বেচারার কি অদ্ভুত পরিবর্তন হোয়েছে। আগে ওকে ঠিক মর্কটের মত দেখতে ছিল। এখন ওকে দেখে 'যব'-এর প্রতিমূর্তির কথা মনে পড়ে যায়।

উকিল বেচারাও বোকার মত পথের মাঝখানে দাঁড়িয়ে পড়েছিলো। পা দুটি দেখেই সে চিনতে পেরেছিল। তাকে দাঁড়িয়ে পড়তে দেখে ল্যানয় শ্লেষের সুরে বললেন: "আপনি ওঁর স্বামী বলেই বুঝি পথ আগলে দাঁড়িয়ে পড়লেন?"

ল্যানয়ের কথায় ও হেসে উঠলো। অন্য কোনো স্বামী এমন অবস্থায় হয়তো স্ত্রীকে খুন ক'রেই বসত। কিন্তু তার চোখ দিয়ে শুধু অঝোরে জলই ঝরে পড়ল। ওর হাসির আওয়াজে তার বুকটা যেন ছিঁড়ে ফালা ফালা হোয়ে গেল। মুহূর্তের মধ্যে জগতের আলো যেন চোখের উপর নিবে গেল। সে একজন পথচারির গায়ের উপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল। কিন্তু এত দুঃখেও ওকে দেখা মাত্র তার মনে উঠল প্রেমের বান। একদিন যে কুঁড়িটিকে সে সযত্নে

চয়ণ ক'রেছিল আজ সেই কুঁড়িই বর্ণে গন্ধে অতুলনীয় ফুলে পরিণত হ'য়েছে। ওর পরীর মত রূপ—চিত্তচাঞ্চল্যকর পীনবক্ষ তাকে আবার উন্মত্ত ক'রে তুললো। সে ভাবল তার সমস্ত ঐশ্বর্যের বিনিময়েও যদি কেবল মাত্র একটি রাতের জন্যে তাকে সে পায় তাহ'লেও কোনো ক্ষতি নেই। প্রকৃত পক্ষে এত প্রেম আজকের দুনিয়ায় সহজে পাওয়া যায় না। আর মেয়েটিকেও আমাদের অন্ততঃ একবার প্রশংসা করা উচিৎ? কারণ স্বামীকে দেখে ও তো তবু চমকে উঠেছিল। আজকাল এমন অনেক স্ত্রীই পাওয়া যায় যারা দাম্পত্য দাবীটাকে অস্বীকার ক'রে দুর্নীতিপরায়ণ জীবন যাপনে বেশ গৌরবই বোধ করে।

যাই হোক, আপনমনে ওর কথা ভাবতে ভাবতে সে পথ এগুতে লাগল। মনে মনে সে ঠিক কোরল—যেমন ক'রেই হোক অন্ততঃ একটিবার ওকে পেতেই হবে।

সুযোগ যখন আসে তখন অপ্রত্যাশিত ভাবেই আসে। বোকারা সেটা অলৌকিক মনে কোরে ছেড়ে দেয় আর চালা-কেরা করে সেটার সদ্ব্যবহার। আমাদের উকিল মশায়েরও তেমনি ভাবেই হঠাৎ সুযোগ এলো। আবার এলো ঠিক পরের দিনই। রাজার একজন ঘনিষ্ট বন্ধু এবং অত্যন্ত বিখ্যাত লোক তার মক্কেল ছিলো। সেদিন সকালবেলা হঠাৎ সেই লোকটি এসে হাজির। সে বলল অবিলম্বে তার বার হাজার ক্রাউন দরকার। আমাদের ধুরন্ধর উকিল

মশাই তাকে বলল যে বার হাজার ক্রাউন তো আর রাস্তায় পড়ে নেই যে কুড়িয়ে নিলেই চলবে—তার জন্যে প্রয়োজন একজন ভাল জামিনদার এবং কত ক'রে সুদ দেবে তার চুক্তি-পত্র। তাছাড়া এক কথায় বার হাজার ক্রাউন বার ক'রে দিতে পারে এমন লোক গোটা প্যারিস শহরটা থেকে খুঁজে বার করা শক্ত। এই কথা বলে সে প্রশ্ন ক'রলে: "কিন্তু আপনার এমন কে পাওনাদার আছে যা'কে এখনি বারো হাজার ক্রাউন দিতে হ'বে?"

তখন সেই ভদ্রলোক চুপি চুপি বললো: "বলছি তোমাকে। কিন্তু খবরদার একথা যেন কখনো না বেরোয়। রাজার রক্ষিতার জন্যে এই ক্রাউন দরকার। আজ সন্ধ্যে-বেলা সে আমার অঙ্কশায়িনী হ'বে—কিন্তু তা'র বদলে ও'কে দিতে হ'বে বিশ হাজার ক্রাউন নগদ এবং আমার ব্রাইএর জমিদারি।"

ভদ্রলোকের কথা শুনে উকিলের তো খাবি খাবার উপ-ক্রম। ভদ্রলোক সবে মাত্র যুদ্ধ থেকে ফিরেছেন—তিনি জানতেন না যে ওর আবার একজন স্বামী আছে।

"তোমাকে যেন অসুস্থ মনে হোচ্ছে?"—তা'র ভাব-ভঙ্গি দেখে তিনি প্রশ্ন ক'রলেন।

"হ্যাঁ, আমার একটু জ্বর হোয়েছে"—ও বলল।

"তা'হলে টাকাটা আপনার ও'কেই দিতে হ'বে?"

"হ্যাঁ।"

"কিন্তু আপনার সঙ্গে এসব বন্দোবস্ত কোরল কে ? ও নিজেই নাকি ?"

"না। ও'র একটি ঝি আছে সেই সব ব্যবস্থা করে। অসম্ভব ধড়িবাজ মেয়ে সে। আমাদের রাজার রক্ষিতাটির মাথায় প্রচুর বুদ্ধি। রাজার কাছ থেকে যে রাতগুলো ও ফাঁকী দিয়ে বার ক'রে নেয় সেইগুলোতে ও বেশ মোটা রকম রোজগার করে।"

"আমার সঙ্গে একজন মহাজনের জানাশোনা আছে বটে। কিন্তু আপনাকে সে টাকা দিতে চাইবে না। তবে একটা উপায় আছে। ঐ চাকরানীটি যদি নিজে এখানে এসে টাকা নিয়ে যায় তো হোতে পারে।"

"ভালই তো ; সুবিধে কোরে ও'কে দিয়ে একটা রসীদও সই করিয়ে নেওয়া যাবে"—ভদ্রলোক হাসতে হাসতে বললেন।

সেই ঝি'টিকে নিয়ে উকিল যথাস্থানে এসে উপস্থিত হোলো। তার কথামত সেই ভদ্রলোক ঝি'টিকে সঙ্গে ক'রে এনে পৌঁছে দিয়েছিলেন। টেবিলের ওপর ডুকাট্গুলো থরে থরে সাজান র'য়েছে। সন্ন্যাসিনীরা যেমন সার বেঁধে মঠে যায় আমাদের উকিল মশাই তেমনি ভাবে সারি সারি ওগুলো সাজিয়ে রেখেছেন। সেই সুন্দর দৃশ্য দেখ্লে মানুষ বোধ হয় নিদারুণ যন্ত্রণার মধ্যেও আনন্দে আটখানা হোয়ে যাবে। টেবিলের ওপরের সোনার স্তূপ দেখে ঝিএরও মাথা

গেল ঘুরে। সুযোগ বুঝে উকিল তার কানে কানে বললো : "এগুলো সবই তোমার।"

"আমার সঙ্গে তোমাকে রাত কাটাতে হবে না। আমার পরিচয়টা বোধহয় তোমার খদ্দের তোমাকে দেয়নি। শোন, আমি তোমার গিন্নীমা যিনি এখন রাজার রক্ষিতা, তা'র স্বামী। এখন তোমাকে একটি কাজ কোরতে হ'বে। এই ক্রাউনগুলো তা'কে দিয়ে এস। তা'কে দিয়ে এলে তোমারটা তুমি পাবে, তখন তোমাকে আমি একটি কাজ দেব—সেটা যদি তোমার অভিরুচি হয় তো ক'রতে পার।"

ঝিটি তখনি উকিলের নির্দেশমত কাজ ক'রে ফিরে এলো। মনে মনে সে দারুণ কৌতূহলী হোয়ে ভাবছিলো, উকিলের সঙ্গে রাত না কাটিয়েও অত টাকা কেন পাবে।

সে ফিরতেই উকিল বলল : "এই নাও তোমার বারো হাজার ক্রাউন। এতগুলো টাকায় বাড়ি, জমি, চাকর-চাকরানী সবই কেনা যায়। এমন কি তিনজন পুরুতের সারা জীবনের পুণ্যফলও এতে কেনা যেতে পারে। কাজেই আমি ধরে নিতে পারি যে এই টাকায় আমি তোমার দেহ মন সবই কিনে নিলাম। এখন আমি বিশ্বাস ক'রে তোমাকে একটি কাজ দিতে পারি। তোমাকে সেই ভদ্রলোককে একটুখানি ঠকাতে হ'বে। তাঁকে বলবে : আজ রাত্রে রাজা তাঁর রক্ষিতার কাছে আসছেন, সুতরাং আজকের রাতটা তাঁকে অন্যত্র কাটাতে হ'বে। এই বলে তুমি তাঁকে সরিয়ে

দেবে—তখন আমি তাঁর এবং রাজার জায়গাটা গ্রহণ কোরব।"

"কিন্তু তা' কি কোরে সম্ভব?"—সে জিজ্ঞেস কোরল।

"মতলবটা তোমাকেই ঠাওরাতে হ'বে, উকিল বলল। আমি তোমাকে কিনে নিয়েছি—কাজেই তোমার মগজের বুদ্ধিটাও এখন আমার। টাকাগুলো আর একবার ভালো কোরে দেখে নাও—তাহ'লেই আমার বৌকে কি কোরে পাইয়ে দিতে হ'বে সে মতলব তোমার মাথায় এসে যাবে'খন। তাছাড়া যে মিলনের ব্যবস্থা তুমি কোরছ সেটা মোটেই পাপ বা অন্যায় নয়। তুমি স্বামী স্ত্রীর মিলন ঘটাচ্ছ—এতে তোমার পুণ্যই হবে।"

"আচ্ছা, একটা উপায় আছে—শুনুন: খাওয়া দাওয়ার পরে আলোগুলো সব নিবিয়ে দেব—আপনাকে সেই অন্ধকারের সুযোগ নিতে হবে। কিন্তু খবরদার; মুখে আপনি যেন একটিও শব্দ উচ্চারণ ক'রবেন না। আমাদের একটা সুবিধা আছে—চরম পুলকানুভূতির সময় উনি কোনো কথা বলেন না—শুধু কাঁদেন এবং ওঁর বক্তব্যও উনি হাতের ছোঁয়ায় বুঝিয়ে দেন। উনি অত্যন্ত ভদ্র জানেন তো? রাজপরিবারের অন্য সব মেয়ের মত নোংরা রসিকতা উনি মোটেই পছন্দ করেন না।"

"ঠিক আছে তা'হলে এই বার হাজার ক্রাউন তুমি নিয়ে যাও। কাজ উদ্ধার ক'রতে পারলে অর্থাৎ আমার ন্যায্য

প্রাপ্য জোচ্চুরী কোরে আমাকে পাইয়ে দিতে পারলে, এর ডবল পাবে”—উকিল আনন্দের আতিশয্যে বলে ফেলল।

উকিল ঝি এর সঙ্গে কথাবার্তা ঠিক ক’রে নিল।—কখন যেতে হ’বে, কেমন দরজা দিয়ে ঢুকবে, কি সংকেত ক’রবে সব সে খুঁটিয়ে জিজ্ঞেস কোরে নিল। ঝি তা’কে সব নির্দেশ দিয়ে টাকাগুলো নিয়ে চলে গেল।

আমাদের উকিল মশাই তখন দাড়ি কামিয়ে সেজে গুজে পরিষ্কার হোলো। খাবারের সঙ্গে সে পেঁয়াজ খেল না—পাছে মুখ থেকে পেঁয়াজের গন্ধ বেরোয়। দামি আতর মেখে সে নিজের দেহের বিশ্রী গন্ধটাকে ঢাকা দিলো। তার কুৎসিত মুখখানাকে সুন্দর করার জন্যে সে যথেষ্ট চেষ্টা ক’রল। সে ভাবল তাকে বেশ সুন্দর দেখাচ্ছে—কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তাকে তখন বোধহয় পৃথিবীর সবচেয়ে কুশ্রী পুরুষ বলে মনে হচ্ছিল। যথা সময়ে সে রু ত্য হিরুনদলে হাজির হ’লো। বহুক্ষণ অপেক্ষা করার পর যখন অন্ধকার বেশ গাঢ় হোয়ে উঠেছে সেই সময় সেই ঝি’টি নিঃশব্দে দরজা খুলে দিল। সে অত্যন্ত সাবধানে রাজার ঘরে ঢুকে পড়ল। ঝি তাকে তার স্ত্রীর বিছানার কাছেই একটা দেয়াল-আলমারির মধ্যে পুরে বন্ধ কোরে দিয়ে গেল। দেয়াল-আলমারির একটা ফুটোয় চোখ দিয়ে সে তার স্ত্রীর সৌন্দর্য দেখতে লাগলো। তার স্ত্রী জামাকাপড় ছেড়ে একটা পাতলা গাউন প’রল।

গাউনের কাপড়টা এমন যে তা'র মধ্যে দিয়ে সবই দেখা যাচ্ছে। ঘরে যে আর কেউ আছে তা তো ও জানত' না। কাজেই বিবস্ত্র হোতে হোতে ও ঝির সঙ্গে হাসি ঠাট্টা কোরতে লাগলো।

"দেখ তো, আমি কি বিশ হাজার ক্রাউন পাবার অযোগ্য ? ব্রাই এর সম্পত্তিটা আর ঐ টাকাটা যে আমাকে দিচ্ছে, এটা কি এমন বেশী কিছু ?"—ও জিজ্ঞেস ক'রল।

কথা বলতে বলতে ও গিরি শিখরের মত শুভ্র কঠিন স্তন দুটি হাতে করে তুলে ধরল। বহু আক্রমণেও ওদে'র মধ্যে এতটুকু শৈথিল্য আন্‌তে পারেনি।

"কোনো রাজাই আমার এই দেহের মূল্য দিতে পারবেনা"—ও বলল। "কিন্তু তবু এ জীবন আর আমার ভাল লাগছে না, আমি ক্লান্ত হোয়ে পড়েছি। শুধু কাজ আর কাজ—কোথাও এতটুকু আনন্দ নেই।"

তারপর হঠাৎ ও হাস্‌তে হাস্‌তে বলল: "আচ্ছা তুমি আমার ভূমিকা গ্রহণ কোরে আমাকে মুক্তি দিতে পারনা ?"

ঝিও হেসে বলল: "চুপ করুন মাদাম, উনি ঘরেই র'য়েছেন।"

—"কে ?"

—"আপনার স্বামী।"

—"কোন স্বামীর কথা বলছ ?"

—"যিনি আপনাকে বিয়ে ক'রেছিলেন।"

—"সে কি ?"—ও আশ্চর্য হ'য়ে প্রশ্ন কোরল।

ঝি তখন ও'কে সমস্ত ঘটনা খুলে বলল। সে ভাবল এতে ভালই হবে—টাকাটাও খোয়া যাচ্ছেনা অথচ ও'র প্রিয়পাত্রীও হোয়ে থাকা যাবে।

সব শুনে ও বলল: "বেশ, তা'র টাকার মূল্য সে নিশ্চয় পাবে। আরো বেশ খানিকক্ষণ আটকান থাক। তারপর তুমি অন্ধকারে আমার বিছানায় গিয়ে শোবে। ঐ বার হাজার ক্রাউন তুমি দেহ দিয়ে রোজগার কর। আমি ও'কে ছোঁবনা। ও'র ছোঁয়া আমার গায়ে লাগলে আমাকেও মর্কটের মত দেখতে হোয়ে যাবে! ও'কে গিয়ে বল: খুব ভোরবেলায় ও'কে চলে যেতে হ'বে—নাহ'লে আমি সব জেনে ফেলব। ভোরের দিকে আমি বিছানায় গিয়ে শোব—ও উঠে কিছুই বুঝতে পারবে না।"

স্বামী বেচারা এদিকে আলমারির মধ্যে ঠাণ্ডায় জমে যাচ্ছে। ঝি তা'র কাছে গিয়ে বলল: "তোমার জীবনের শুভ মুহূর্ত এসে গেছে। মাদাম আজ খুব সুন্দর ব্যবস্থা ক'রেছেন। কিন্তু খবরদার কোন কথা বলে ফেলনা যেন—তা'হলেই আমি গেছি"........

আরো খানিকক্ষণ পরে সব আলো নিবে গেল। রাজার প্রিয়ার বিছানায় ঝি গিয়ে শু'ল। আর তা'র

মনিবানী গেল ঘর থেকে বেরিয়ে। উকিল তখন গরম বিছানায় গড়াগড়ি দিচ্ছে আর ভাবছে: "কি আরাম!" কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি, ঝি তা'র টাকাটা ভাল-ভাবেই উসুল কোরে দিল। নানা রকম ছলাকলায় সে উকিলকে মত্ত কোরে তুলল। উকিল ভাবতে লাগল: রাজার রক্ষিতার সঙ্গে গৃহস্থের বৌ-এর কত তফাৎ। মুখে কোন কথা বলে না, শুধু হুঁ, হাঁ, ক'রেই ও'রা পরস্পরকে সব বুঝিয়ে দিতে লাগল। এমনিভাবে বহুক্ষণ চলার পর উকিল শেষ পর্যন্ত সম্পূর্ণ শক্তিহীন হোয়ে নেতিয়ে পড়ল। কিছুক্ষণের মধ্যেই সে গাঢ় ঘুমে আচ্ছন্ন হোয়ে গেল। কিন্তু ঘুমোবার আগে সে ঝি-এর কয়েকটা চুল চিহ্ন হিসাবে রাখার জন্য কায়দা কোরে ছিঁড়ে নিল। সযত্নে সে চুলগুলোকে হাতের মুঠোয় রেখে দিল। এদিকে ভোর হবার সঙ্গে সঙ্গে ঝি বিছানা ছেড়ে নেমে গেল আর তা'র জায়গায় এসে শু'ল ও'র স্ত্রী। ঝি নেমে গিয়ে ও'র কপালে মৃদু আঘাত কোরে জাগিয়ে দিয়ে কানে কানে বলল: "ভোর হোয়ে গেছে—জামাকাপড় প'রে নিয়ে চলে যাও।"

সারারাত আমোদের পর এই ভাবে চলে যেতে উকিলের অত্যন্ত মন খারাপ হোয়ে গেল। কিন্তু হঠাৎ হাতের চুলগুলোর দিকে চেয়ে ও বলে উঠল: "একি, এগুলোর রং এত ফ্যাকাসে আর ওগুলো অত ঘন কালো কেন?"

"আহা! তাও জান না!"—ঝি তাচ্ছিল্যের ভংগীতে বলল: উপড়ে নিলে সব কিছুই মরে যায়— আর মরে গেলেই ক্যাকাসে হোয়ে যায়"—এই বলে হি হি কোরে হাসতে হাসতে ও'কে সে ঠেলে ঘর থেকে বার ক'রে দিল।

কিছু দিন পরেই সব জানাজানি হ'য়ে গেল। লজ্জায় দুঃখে বেচারা মারা গেল। আমাদের এই উকিলের নাম কেরণ। এই ঘটনার পর থেকে ওর স্ত্রীর নাম হোলো লা বেল ফেরোনিয়ার। সে রাজাকে ছাড়ার পর বুজানকোয়ার তরুণ জমিদারকে বিয়ে ক'রে সুখে দিন কাটাতে লাগল। বুড়ো বয়সে সে অনেক সময় হাসতে হাসতে এই মজার কাহিনীটা বলত আর সেই সঙ্গে মন্তব্য কোরত: "আমি কোন দিন ঐ হতভাগাকে স্পর্শও করিনি!"

* * *

তবে গল্পটা থেকে আমরা এইটুকু বুঝি যে, যে স্ত্রী দাম্পত্য জীবনকে স্বীকৃতি দিতে চায় না তাকে বেশী ভালবাসা উচিৎ নয়।

গাড়ল

লাবারেঁর কথায় বাধা দিয়ে বলে উঠলুম: বলি বন্ধু, বার বার তুমি মোরিনের নামের আগে গাড়ল বিশেষণটি লাগাচ্ছ কেন বলত? আমি তো একজনকেও ভূভারতে দেখতে পেলুম না যে ওই লোকটাকে ওই ভাবে বিশেষিত না করলো! আশ্চর্য কাণ্ড যা হোক!

পেঁচার মতো চোখ ঘুরিয়ে আমার দিকে তাকালো লাবারেঁ: লা রোচেলি থেকে আসছো না তুমি? আর তুমি মোরিনের কাণ্ড কারখানা জানোনা, এই কথা বলতে চাও?

স্বীকার করতেই হোলো আমার অজ্ঞতা মোরিন সম্বন্ধে। তখন বন্ধুবর কিছুক্ষণ হাতটা ঘোষে নিয়ে শুরু করলো তার কাহিনী:

—মোরিনকে তুমি তো জানতে, কেমন না? কুই দ্যু লা রোচেলিতে তার বিরাট পোষাকের দোকানের কথাও নিশ্চয় ভোলোনি।

—হুঁ, বিলক্ষণ!

—তাহলে তো আর কথা নেই। তুমি নিশ্চয় জানো ১৮৬২ কি ৬৩ সালে দিন পনেরোর জন্যে সে প্যারীতে

প্রমোদ ভ্রমনে পাড়ি জমিয়েছিল। ব্যাপারটা আসলে অমনধারা হ'লেও সে কিন্তু সবাইকে জানিয়েছিলো মালপত্তর কিনতে চলেছে। জানো তো বন্ধু একজন গেঁয়ো দোকানদারের প্যারীতে এক পক্ষ কাটানো মানেটা কি? শিরায় শিরায় রক্ত টগবগিয়ে না ফুটে যায় কখনো! প্রতি সন্ধ্যায় থিয়েটার, মেয়েদের পোষাকের ছোঁয়া, ধারাবাহিক উত্তেজনা—সব কিছু মিলিয়ে এক-জনকে উন্মাদ ক'রতে পারাটা মোটেই বেশি নয়। নাচ-য়লিদের, অভিনেত্রীদের আঁট সাঁট পোষাক, মেদ বহুল কাঁধ, গোল গোল পা ছাড়া আর কিছুই কেউ লক্ষ্য করে না। শুধু তা-ই নয়, এ সবি তার একেবারে নাগালের মধ্যে—যাকে বলে মুঠোর ভেতরে। দেহের ছোঁয়া পেতে কোনো রকমই প্রতিবন্ধকতা নেই। আর খাবারের কথা যদি বলো কেউ কখনো আজে বাজে কিছু দিয়ে ক্ষিদে মেটায় না! এ একেবারে নিঃসন্দেহে। কেউ যদি বা সুযোগ ছেড়ে আসে তাহ'লেও রক্ষে নেই, প্রাণটা তার আনচান্ ক'রতে থাকে সব সময়েই। আর? আর মিষ্টি মধুর অধর-সুধার আস্বাদ পেতে ঠোঁট দুটির কতোই না কাতরতা দেখা যায়।

মোরিনের অবস্থাটা এমনই হ'য়ে উঠলো, আর সেটা নজরে পড়লো বিশেষ ভাবে সেদিন রাত্তিরে। ৮-৪০-এর এক্সপ্রেসে রওনা হ'চ্ছে লা রোচেলিতে নিজের বাড়িতে।

ষ্টেশনে ওয়েটিং রুমে বসতে মন সরলো না, হান্ টান্ করে ফিরতে লাগলো গোটা প্ল্যাটফর্মে অধীর, অস্থির। একটি ভারি সুন্দর দেখতে মেয়ে সংগিনী বৃদ্ধাকে বিদায়-চুম্বন ক'রছিলো, মোরিন পায়চারি ক'রতে ক'রতে এসে হাজির হোলো সেখানে। মেয়েটির মুখের ঢাকা তখন স্থানচ্যুত, পাতার আড়াল থেকে আত্মপ্রকাশ ক'রে আছে রক্তরাঙা গোলাপ ফুল! তাই দেখে মোরিনের মুখে অস্ফুটে ধ্বনিত হ'য়ে ওঠে: বলিহারি! সুন্দরী বটে!...

বৃদ্ধাকে বিদায়-সম্ভাষণ জানিয়ে মেয়েটি ওয়েটিং রুমে ঢুকে গেল, মোরিনও গেল সংগে সংগে। খানিক পরে দেখা যায় মেয়েটিকে প্ল্যাটফর্মের ওপর, ছায়ার মতন মোরিন তার পিছু নেয়। শেষে একটা খালি কামরায় তাকে উঠতে দেখে মোরিনও সেই গাড়িতে তাড়াতাড়ি এসে হাজির হয়। রাত্তিরের গাড়িতে লোকজনের বিশেষ ভিড় নেই, বাঁশী বাজিয়ে তো গাড়ি ছেড়ে দিলো। ওদের কামরায় শুধু ওরা দুজন—মোরিন আর সেই সুন্দরী মেয়েটি। এমন ভাবে মোরিন দেখছে মেয়েটিকে যে মনে হয় চোখ দিয়েই ওকে গিলে ফেলবে!

মেয়েটির বয়েস জানতে চাইছো? কতো আর হবে, বড়ো জোর উনিশ কি কুড়ি। ফর্সা, ঢ্যাঙা, চোখ দুটো টানা টানা। র‍্যাগে পা দুটি ঢেকে নিয়ে আসনের ওপর লম্বা হ'য়ে পড়লো কিছুক্ষণের মধ্যে। হ্যাঁ, ঘুমোবার জন্যেই তার এ ব্যবস্থা।...

'মোরিনের মনে তখন সংখ্যাহীন প্রশ্নের জটলা—আশ্চর্য তো! কে এ নারী?

যতো ভাবে ততোই নানান্ পরিকল্পনা মাথায় খ্যালে, স্বগত বলে: কতো য়্যাডভেঞ্চারের কথাই তো জীবন ভোর শুনে আসছি, আর মজা এমন সে সবই রেলে যেতে আসতেই ঘটে থাকে। আমার ভাগ্যেও কি তেমনি 'সিকে ছিঁড়লো' নাকি? উঁহু, কিছুই ঠিক ক'রে বলা যায় না। ভাগ্যদেবী প্রসন্না হ'লে মুহূর্তে সোনা ফলতে কতক্ষণ—? এখন দরকার শুধু একটু সাহসী হওয়া। ড্যাণ্টনই না বলেছেন স্পর্ধা চাই, স্পর্ধা! সব সময়ে স্পর্ধা দরকার! উঁহু, ড্যাণ্টন নয় মিরাবো-ই বোধ হয়···দুত্তোর যেই হোক, সে খোঁজে কাজ নেই! কিন্তু আমার অমন ধারা স্পর্ধা নেই বলেই তো ঝঞ্ঝাট! আহা রে, মানুষের মনের কোণের খুঁটিনাটি যদি জানা যেত, একমাত্র সেটা জানলেও চলতো। আমি বাজী ফেলে বলতে পারি প্রতিটি মানুষের নিজের অজ্ঞাতে প্রতিদিন কতো অসংখ্য সুযোগ যে আসছে আর ফিরে যাচ্ছে! শুধু একটু আকার ইংগিত পেলেই আমি বুঝতে পারবো মেয়েটার অভিরুচি কি!—

তারপর মোরিন কল্পনায় তার জয়যাত্রার জলছবি দেখতে থাকে—সে যেন দুঃসাহসিক কিছু করছে, মেয়েটির জন্যে যৎসামান্য কিছু করে দিচ্ছে, কথা কইছে বীরত্ব-

ব্যঞ্জক, যার ফলে সুন্দরীর স্বীকৃতি হ'চ্ছে লাভ···হয় তো বা তার ফলে···তুমি যা ভাবছো তাই!···

কিন্তু বৃথাই! কোনো রকম উপায় খুঁজে পেল না আলাপ পরিচয়ের। অনুকূল অবস্থার জন্যে চঞ্চল বক্ষে প্রতীক্ষা করে মোরিন। রাত্রি শেষ হয় মেয়েটি তখনো ঘুমোচ্ছে, মোরিন কিন্তু নিজের পতনের কথা ধ্যান করে চলেছে। দিনের আলো ফুটে ওঠার কিছুক্ষণের মধ্যেই সূর্যের দেখা মেলে। আশীর্বাদের মতো নরম রশ্মি এসে পড়ে মেয়েটির ঘুমন্ত মুখেচোখে, টুকটুকে গালে—ঘুম ভেঙে যায় তরুণীর। আলিস্যি ভেঙে উঠে বসে তাকায় সে জানলা দিয়ে অপস্যয়মান গ্রামাঞ্চলের দিকে। পরে চোখ ফিরিয়ে ছাখে মোরিনকে। মুখে ফুটে ওঠে হাসির ঝলক—প্রসন্ন হাসি, যেমন হাসি মেয়েরা খুশি হয়ে হেসে থাকে! সেই উজ্জ্বল মুখ চোখ আর হাসির ধাক্কায় মোরিনের সারা শরীরে শিহরণ বয়ে যায়! নিশ্চয় ওই হাসি তারই জন্যে, এ নিশ্চয় সুচিন্তিত আমন্ত্রণ, এক কথায় বলা যায় অতি বাঞ্ছিত ইশারা—এরি জন্যে তো তার সুদীর্ঘ পথ-চাওয়া। ও হাসির অর্থ হচ্ছে 'ওরে গাড়ল উজবুক গাধা, স্রেফ একটা খুঁটির মতো সারাটা রাত বসে বসে কাটিয়ে দিলি!

আমি কী ভালো দেখতে নই—ছাখোতো একবার নজর করে? তবু তুমি রাত ভোর একটা সুন্দরী মেয়েকে

একলা পেয়েও জড়ভরতের মতো বসে রইলে, হাঁদা কোথাকার!

মেয়েটি হাসছে, তখনো হাসছে, দৃষ্টি তার দিকেই নিবদ্ধ। নতুন করে আবার হাসতে শুরু করে···কোনো যুৎসই কথা খুঁজে না পেয়ে মোরিনের মাথা তখন খারাপ হবার উপক্রম। এমন অবস্থায় কাপুরুষোচিত বিক্রমে মনে মনে বলে 'যা থাকে কূল কপালে, সবকিছু আমি খোয়াতে রাজী'—বলেই হঠাৎ কোনো রকম সতর্ক হবার অবসর না দিয়ে দুহাত প্রসারিত করে ঠোঁট উঁচিয়ে তাকে জড়িয়ে ধরে পাগলের মতো পর পর চুমু খেয়ে বসে!

জ্যা-মুক্ত ধনুকের মতো ছিট্‌কে ঘুরে গিয়ে পড়ে মেয়েটি। চেঁচিয়ে বলতে থাকে: বাঁচাও বাঁচাও!

নিদারুণ ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে গাড়ির দরজা খুলে ফেলে বাইরে ঘন ঘন হাত নাড়তে থাকে। শেষে ভয়ে ভাবনায় এমন হয়ে যায় যে গাড়ি থেকে লাফিয়ে পড়বার চেষ্টাও করে, তাই দেখে মোরিন ওর স্কার্ট টেনে ধরে তোত্‌লামি করে বার বার বল্‌তে থাকে: দোহাই, দোহাই আপনার···

'ট্রেণের গতি মন্থর হয়ে শেষে থেমে যায়; মেয়েটির ভয়ার্ত ইশারায় ছুটে আসে দুজন গার্ড। তাদের দেখে মেয়েটি তাদের হাতে এলিয়ে পড়ে জ্ঞান হারিয়ে ফেলে। অজ্ঞান হবার আগে অস্পষ্টস্বরে শুধু বলে: ওই লোকটা আমাকে—আমাকে······

সে ষ্টেশনটির নাম হচ্ছে 'ম্যজ'; ফরাসী পুলিশ তো তক্ষুনি এসে মরিনকে গ্রেফতার করলো। জ্ঞান হলে মেয়েটির অভিযোগ পুলিশ লিখে নিলো। হতভাগ্য কাপড়-অলার রাত্রি পর্যন্ত বাড়ি যাওয়া হোলো না, উপরন্তু প্রকাশ্যস্থানে নীতি-বিগর্হিত কাজ করার জন্যে আইনের খড়্গ মাথার ওপর ঝুলতে থাকলো।

দুই

সে সময় আমি একখানা কাগজের সম্পাদকতা করি। কাফে-দ্য-কমার্সে প্রতিদিন মোরিনের সংগে আমার দেখা হোতো। অমন য়্যাডভেঞ্চার যেদিন অনুষ্ঠিত হয় তার পরের দিনই এলো দেখা করতে। কি করবে না করবে কিছুই জানেনা সে। আমি থাকতে না পেরে স্পষ্টই বললুম: শূয়োরের সংগে তোমার কোনোই তফাৎ নেই! এধরনের কাজ কোনো মানুষে করতে পারে না!...

কাঁদতে কাঁদতে সে বললে: বউ তাকে বেশ ঘা কয়েক দিয়েছে! তার ব্যবসা যে এবার 'ডকে' উঠবে তা বুঝতে পারছে সে এখন থেকেই। তাছাড়া সুনাম, প্রতিপত্তি কিছুই আর অবশিষ্ট রইলো না—বন্ধুবান্ধবেরা তার দিকে ফিরেও তাকাবে না!

খুব ধরা-পাকড়া করাতে দয়াপরবশ হয়ে আমার বন্ধু রিভেটকে ডেকে পাঠালুম পরামর্শের জন্যে। ছোটোখাটো

বুদ্ধিমান লোক এই রিভেট, একটুখানি খুঁচিয়ে কথা বলার অভ্যেস আছে মাত্র।

বন্ধু তো পাবলিক প্রসিকিউটরের সংগে দেখা করতে বুদ্ধি দিলো। পাবলিক প্রসিকিউটরও আমার বন্ধু লোক। আমি তখন মোরিনকে বাড়ি পাঠিয়ে দিয়ে চললুম ম্যাজিস্ট্রেটের সংগে দেখা করতে। তিনি জানালেন মাদমোজেল হেন্‌রিয়েষ্ট বোনেল অর্থাৎ সেই অপমানিতা তরুণীটি অল্প কিছুদিন হোলো প্যারীতে গভর্ণেস হিসাবে সার্টিফিকেট পেয়েছে। তার কাকা ম্যজ-এর বিশিষ্ট ব্যবসায়ী, সেখানেই কাকাকাকীর কাছে ছুটির ক'দিন কাটিয়ে আসছিলো। কিন্তু কেসটা বেশ ঘোরালো হয়ে উঠেছে, কারণ ওই কাকা মোরিনের বিরুদ্ধে নালিশ ঠুকে দিয়েছেন! বাদীর তরফ থেকে যদি মোকদ্দমা তুলে নেয়া হয় তাহ'লে আদালতের কোনো আপত্তি হবে না—কর্তৃপক্ষের সংগে সেইরকম কথাই হোলো। এখন দরকার আমাদের সেই ভদ্রলোককে রাজী করানো!—

মোরিনের বাড়ি হাজির হয়ে দেখি বেচারী দুঃখে দুর্দশায় উত্তেজনায় বিছানা নিয়েছে! তার স্ত্রী আমাকে নিয়ে গেল ঘরের মধ্যে; হাড় বারকরা চেহারা মহিলাটির; বেশ ঢ্যাঙা, দুচার গাছা দাড়ি ঝুলছে গালে। কতক্ষণ ধরে না জানি গালমন্দ করছিলো স্বামীকে, আমাকে চীৎকার করে বললে গাড়ল মোরিনটার সংগে দেখা করতে এসেছো? ওই যে তিনি···

ওই কথা না বলে ছুহাত কোমরের ওপর রেখে সে বিছানার পাশে গিয়ে খাড়া হয়ে রইলো। ঘটনা যথাযথ বিবৃতি করলুম, মোরিন অমুনয় করতে লাগলো কাকাকাকীর সংগে দেখা করবার জন্মে।

ব্যাপারটা বেয়াড়া ধরনের হলেও রাজী হতে বাধ্য হলুম। ও কিন্তু বার বার অমুনয় করে যায়ঃ বিশ্বাস করুন তাকে আমি মোটেই চুমু খাইনি, দিব্যি করতে বলেন তাও করছি !···

'আস্ত একটি গাড়ল ছাড়া তুমি আর কিছু নও'— মন্তব্য করলুম আমি। তারপর খুশিমতো খরচ করবার জন্মে হাজার খানেক ফ্রাঁ পকেটস্থ করলুম। মেয়েটির খুড়োমশাইয়ের বাড়িতে যাওয়া একেবারে একা উচিৎ হবে না মনে হওয়ায় রিভেটের শরণাপন্ন হলুম। বন্ধুটি রাজী হ'য়ে জানালো লা-রোচেলিতে সেই বিকেলে কাজ আছে তার সেইজন্মে অবিলম্বে যাত্রা করা প্রয়োজন। অতএব তখুনি বেরিয়ে পড়া গেল।

ঘন্টা ছুয়েকের ভেতর একটি মনোরম পল্লী-ভবনের সামনে হাজির হয়ে কালবিলম্ব না করে ঘণ্টাধ্বনি করলুম। দরজা খুলে দিলো একটি সুদর্শনা তরুণী, অমুমানে বুঝতে দেরি হোলো না সে-ই এই পর্বের নায়িকা। নিম্নস্বরে রিভেটকে বল্লুমঃ তাজ্জব ব্যাপার ! মোরিনের অবস্থাটা এবার বুঝতে পারছি !—

খুড়ো মশাই অর্থাৎ মঁসিয়ে টনিলেট রাজনৈতিক মতবাদে আমাদের সমধর্মী। আমাদের উভয়কে সানন্দে গ্রহণ করলেন। দু দুটি পত্রিকা সম্পাদক একত্রে তাঁর অতিথি, তাতে তিনি ভারি খুশি।

তাঁর হাবভাব দেখে রিভেট চুপি চুপি বললে: গাড়ল মোরিনটার ব্যাপারের একটা সুরাহা করা যাবে বলে মনে হচ্ছে হে!...

ভাইঝি ঘর থেকে বেরিয়ে গেলে বেয়ারা প্রসংগের অবতারণা করলুম। এই কেলেঙ্কারীর বিবরণ কী পরিমাণ সুনাম ক্ষুণ্ণ করবে তাঁর ভাইঝির, সে সম্বন্ধে তাঁকে অবহিত করতে লাগলুম। নানান্‌ভাবে ফুলিয়ে বলতে থাকলুম কতো রকম কথা। কাণ্ডটা যে শুধু চুমু খাওয়ার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিলো এটা বিশ্বাস করবে না একথাও বললুম। আর বললুম মেয়ে মানুষের সম্ভ্রমহানির পক্ষে এটা যথেষ্ট নয় কী?

মনে হোলো বৃদ্ধ ভদ্রলোক এবিষয়ে কিছু ঠিক করেননি; স্ত্রীর সংগে পরামর্শ না করে কিছু করতে পারবেন বলেও বোধ হোলো না। স্ত্রীর বাড়ি ফিরতে একটু বেশি রাত হবে শোনা গেল।

বৃদ্ধ হঠাৎ সোল্লাসে চেঁচিয়ে উঠলেন: ভারি সুন্দর একটা আইডিয়া মাথায় এসেছে মশাই শুনুন, শুনুন— এখানে খাওয়া দাওয়া করে রাত্রে ঘুমিয়ে থাকুন, তারপর

গিন্নি ফিরলে যা হোক একটা ব্যবস্থা করে ফেলতে পারবো।

প্রথমটা রিভেট আপত্তি করছিলো কিন্তু মোরিনের ব্যাপারটা হেস্তনেস্ত করবার জন্যে সে আমন্ত্রণ গ্রহণ করলো।

মঁসিয়ে উজ্বল মুখে ভাইঝিকে ডেকে পাঠালেন। মাঠে একটু বেড়াবার প্রস্তাব করে বললেন: এসব কথাবার্তা কালকের জন্যে আমরা তুলে রাখি, কেমন ?—

রিভেটের সংগে পলিটিক্সের আলোচনা শুরু করে দিলেন তিনি। কিছুক্ষণের মধ্যে দেখলুম সেই মেয়েটির সংগে আমি বেশ কিছুটা পিছিয়ে পড়েছি ! মেয়েটির কথা বেশি আর কী বলবো—সত্যিই সে লোভনীয়—পরম লোভনীয়! খুব সাবধানে তার য়্যাডভেঞ্চার সম্বন্ধে কথা কইতে লাগলুম—ওকে মিত্রভাবে অনুপ্রাণিত করাই আমার উদ্দেশ্য।

ওসব কথা শুনে তার কিন্তু একটুয়ো সংকোচ জাগলো না, লক্ষ্য করলুম গোটা ব্যাপারটা খুবই উপভোগ করছে !

. আমি বললুম: আপনিই ভেবে দেখুন মাদ্‌মোজেল, ব্যাপারটা আপনার পক্ষে কতোটা বিশ্রী হবে! কাঠগড়ায় দাঁড়ানো হাজারো কৌতূহলী চোখের সামনে, রেলগাড়ির ঘটনার কথা দশজনের সামনে নিজ মুখে বলাটা কী নোংরা হবে! নিজেদের মধ্যে বলচি, সেদিন কাউকে সাহায্যের জন্যে না ডেকে সেই হতচ্ছাড়াটাকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে অন্য গাড়ীতে চলে যাওয়াই কি আপনার উচিত ছিলো না। বলুনতো আপনি ?

হেসে উঠে মেয়েটি বলে: কথাটা আপনার খুবই সত্যি স্বীকার করছি, কিন্তু করবো কি বলুন, যে ভয়টা পেয়েছিলুম প্রথমটায়। আর হবেনা-ই বা কেন, ভয় পেলে কারুর মাথার ঠিক থাকে বুঝি? ব্যাপারটা বুঝতে পেরেই মেজাজ আমার খারাপ হয়ে গেল, বলবো কি দুঃখুবোধও করেছিলুম। কিন্তু তখন আর সময় ছিলো না। আপনার নিশ্চয় মনে আছে সে গর্ধভটা পাগলের মতো আমার ওপর এসে পড়েছিলো। সে দৃশ্য যদি দেখতেন—মুখে একটা কথা নেই, কেবল ড্যাব্‌ডেবে চোখে উন্মাদের দৃষ্টি! সে যে আমার কাছে কি চাইছে তা-ও ছাই বুঝতে পারিনি।

পূর্ণ দৃষ্টিতে আমার দিকে চেয়ে রইলো সে—না হোলো একটু দ্বিধা না করলো সামান্য সংকোচ। মনে মনে আমি বলি: ভারি অদ্ভুত মেয়ে তো তুমি! বুঝতে পারছি কি জন্যে মোরিন গাড়লটা ভুল করে বসেছিলো। মস্‌করা করে বলি: তাহলে স্বীকার করুন মাদ্‌মোজেল এ অপরাধের ক্ষমা আছে। সামনে যদি এমন সুন্দরী মেয়ে বসে থাকে তাহলে তাকে চুমু খাবার সাধ কার না হয়?

ঝক্‌ঝকে দাঁতের ঝলক্ খেলে যায়, আরো হাসি ঝরে পড়ে শ্রীমতীর ঠোঁট বেয়ে। বলে: কামনায় আর কাজের মাঝে ফারাক্ আছে বিস্তর বুঝলেন মঁসিয়ে?

খুব স্পষ্ট না হোলেও কথাগুলি প্রকাশের ভংগিটা

যেন কেমন ধারা মনে হোলো। হড় বড়িয়ে প্রশ্ন করে বসি: আচ্ছা মনে করুন এখন আমিই আপনাকে চুমু খেলুম—কী করবেন আপনি?

আমার আপাদমস্তক লক্ষ্য করা বন্ধ রেখে ধীরভাবে মেয়েটি বললে: ওঃ, আপনি? সে হোলো অন্য ব্যাপার।

ব্যাপারটা যে এক নয় এ আমিয়ো ভালো করেই জানতুম। পাড়ার পাঁচজনে আমার রূপের প্রশংসায় পঞ্চমুখ, আমার নামের আগে দু চারটে বিশেষণ তারা সব সময়েই ব্যবহার করে থাকে তাও কানে আসে বৈকি। বয়েসটিয়ো যথেষ্ট কাঁচা সে সময়—তিরিশেরই মধ্যে।

জিজ্ঞেস করলুম: কারণটা জানতে পারি কী?

মাংসল কাঁধটি সংকুচিত করে জবাব দেয় হেন্‌রিয়েটা: কারণ আপনি ও লোকটার মতো বেকুব নন্‌!

এবং কটাক্ষপাত করে সেই সংগে জুড়ে দেয়: আর আর—অমন কুচ্ছিতও নন্‌।

আমাকে এড়িয়ে যাবার কোনো রকম সুযোগ না দিয়ে তার গোলাপী গালে এঁকে দিলুম তপ্ত চুম্বন-রেখা।

ছিট্‌কে সরে গেল সে খানিকটা, কিন্তু বড়ই দেরিতে। ব'ললে: হুঁ, তেমন লাজুক নন্‌ দেখছি। তবে আর কখনো এমন কাজ করবেন না!

বিহ্বল চোখে তাকিয়ে নীচু গলায় বললুম: বিশ্বাস করুন, আমি ম্যাজিষ্ট্রেটের সামনে মোরিনের মতো

অপরাধী হয়ে দাঁড়ানো ছাড়া আর অন্য কিছু কামনা করি না।

কেন?—প্রশ্ন হোলো।

একভাবে চেয়ে থেকে জবাব দিই: গোটা ছনিয়ার সব চেয়ে সুন্দর প্রাণী বলে—আপনার ওপর বলপ্রয়োগ করা একটা সম্মানের কাজ বলে, আর এই জন্যে যে, আপনার ওই রূপরাশি দেখে একবাক্যে সকলে বলবে: হ্যাঁ, লাবারে উপযুক্ত পাওনাই পেয়েছে; কিন্তু তবু সে ভাগ্যবান এটা স্বীকার করতেই হবে।

প্রাণ খুলে হেসে উঠলো শ্রীমতী আমার রক্তে কামনার আগুন জ্বালিয়ে। বললে: ভারি অদ্ভুত লোক তো দেখছি।

অদ্ভুত কথাটা বলেছে কি না, সবলে তাকে বুকে টেনে নিয়ে চুমুতে চুমুতে আচ্ছন্ন করে দিলুম। যেখানে সেখানে গালে ঠোঁটে চোখে কপালে ঘাড়ে অর্থাৎ যতটুকু অনাবৃত জায়গা মিললো সেখানেই একের পর এক ছাপ পড়ে গেল আমার অত্যুগ্র কামনার।

লজ্জায়, ক্রোধে রাঙা হয়ে বহু কষ্টে এক সময় আমার আলিংগন মুক্ত হয়ে তীব্র স্বরে বললো: ভারি অভদ্র তো আপনি মঁসিয়ে। আপনার কথায় কান দেয়াটাই আমার মুখ্যমি হয়েছে।

কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে স্খলিত কণ্ঠে বলতে থাকি:

ক্ষমা করুন মাদ্‌মোজেল, আপনাকে উত্যক্ত করে ফেলেছি। কাজটা আমার জানোয়ারের মতো হয়ে গেছে, সে জন্যে আর রাগ করবেন না। যদি জানতেন—

বৃথাই ওজর খুঁজতে থাকি আমি। মেয়েটি বলে: ও সব জানবার কোনোই দরকার নেই আমার।

হঠাৎ কথা খুঁজে পাই যেন: আমি আপনাকে ভালোবাসি মাদ্‌মোজেল।

অবাক হয়ে হেন্‌রিয়েটা চেয়ে থাকে আমার মুখের দিকে। আমি বলি: সত্যিই বলছি ভালোবাসি, আমার কথা শুনুন। মোরিন টোরিন আমি জানি না, তার সম্বন্ধে কোনো মাথা ব্যথাও নেই। হোক তার বিচার কিংবা হাজতবাস। গত বছর আপনাকে প্রথম দেখি, সেই থেকে আপনার চিন্তাই আমায় পেয়ে বসেছে, একথা যদি বিশ্বাস না করেন তাতেও ক্ষতি নেই। আপনাকে একবার দেখার বাসনা আমায় এমনই পেয়ে বসেছিলো যে মোরিনকে উপলক্ষ্য করে হাজির হয়েছি এখানে। এই যে নীতির সীমা ডিঙিয়ে গেছি, এ শুধু পাকেচক্রে। এর জন্যে আমি জোড় হাতে ক্ষমাভিক্ষা চাইছি।

দৃষ্টিতে আমার সততার রেখা ফুটে উঠেছিলো, তা পাঠ করে হেনরিয়েটা আবার হেসে উঠতে চায়; অস্ফুট স্বরে বলে: হাম্‌বাগ কোথাকার!

হাত তুলে আমি আন্তরিক ভাবে বলতে থাকি:

আমি যে সত্যিই কপটতা করিনি এটা মনে প্রাণে বিশ্বাস করুন, দিব্যি করে বলচি, খুবই সত্যি এটা।

—তাই নাকী? ওর সরল প্রশ্ন আমার প্রতি।

আমরা তখন সম্পূর্ণ একা; রিভেট আর খুড়োমশাই হাঁটতে হাঁটতে কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেছেন, পাত্তাই নেই। আমার প্রকৃত প্রেমের ঘোষণা করবার সময় নরম হাতদুটি নিষ্পিষ্ট করতে করতে চুম্বন করছিলুম, সেও মনের মতো নতুন কিছু একাগ্রভাবে শুনছিলো। হয় তো এ কথার কতোটা গ্রহণ বা বর্জন করবে তার সম্বন্ধে মতি স্থির করতে পারছিলো না। আমি এতোই উত্তেজিত হয়ে পড়েছিলাম যে কথার শেষে বোধগম্য হলো আমার বক্তব্য বিষয়টা। আমার পা দুটো ঠক ঠক করে কাঁপছিলো, কী হবে ভেবে উৎকণ্ঠায় ফ্যাকাশে হয়ে পড়েছিলাম তবু তার সরু কোমর হাত দিয়ে জড়িয়ে নিয়ে ফিস্‌ফিসিয়ে নরম কথায় কানে কানে বলছিলাম মনের কথা। এমন্‌ই আত্মহারা হয়ে পড়েছিলো হেন্‌রিয়েটা যে তাকে মনে হচ্ছিলো বুঝিবা প্রাণহীন।

আস্তে আস্তে তার হাতটা এসে লাগলো আমার হাতে, জোরে চেপে ধরলো কামনা ভরে। আমিয়ো কম্পিত হাতে তার কটিদেশ বৃত্তাকারে জড়িয়ে ধরলাম। এবারে সে আর সরে গেল না, আমার তৃষিত অধর ওই রাঙা গালের ওপর রাখলাম, সহসা সে আমার সাহায্য

না নিয়েই সবলে ওষ্ঠাধর চেপে ধরে। কিছুতেই আশা মেটেনা দুটি বুভুক্ষু হৃদয়ের; চুম্বনের মাত্রা আরো কতো দীর্ঘ হোতো কে জানে, চকিতে স্বপ্নজাল ছিড়ে যায়। পেছনে হাম্ হাম্ শব্দ হতেই সে ঝোপের আড়ালে আত্মগোপন করলো, আমিয়ো ঘুরে দাঁড়াতেই দেখলাম রিভেট জোর পায়ে আমার দিকেই আসছে। গম্ভীর মুখে হাসির রেখা পর্যন্ত না ফুটিয়ে বললে: এই উপায়েই তাহলে গাড়ল মোরিনটার ব্যাপারের সালিশী করবে।

দেমাকের সংগে জবাব দিই: নিজের ওজন মাফিক সবাই কাজ করে থাকে বন্ধু। তারপর খুড়ো মশায়ের খবর কী? কথাবার্ত্তা কী হোলো? এদিকে ভাইঝির হয়ে আমিই তোমায় জবাব দেবো।

—তাঁর সংগে আলাপ আলোচনা আমার পক্ষে সৌভাগ্য সৃষ্টি করতে পারেনি, এ বিষয়ে ভুল নেই।—

আর কোনো কথা না বলে আমরা উভয়ে বাড়ির ভেতরে প্রস্থান করলুম।

তিন

রাত্রে খেতে বসে অবস্থা আমার চরমে উঠলো, যাকে বলা চলে অর্ধপাগল অবস্থা! আমি বসেছিলাম হেন্‌রিয়েটার পাশে, ফলে আমার বাঁ হাত টেবিল ক্লথের নীচ দিয়ে ঘন ঘন তার হাতের ছোঁয়া পেতে লাগলো, কখনো বা

অন্য কিছুরও। উভয়ের পায়ে পায়ে জড়াজড়ি হয় অন্যের চোখের আড়ালে, কখনো বা গভীর ভাবে পরস্পরে পরস্পরকে চেয়ে চেয়ে দেখি।

আহারাদির পর চাঁদের আলোয় বেড়াতে বেরুলাম দুজনে; পথে যা মনে এলো মধুর করে কানে কানে কইতে লাগলুম। বুকের একেবারে পাশটিতে টেনে নিয়ে চুম্বনের বন্যায় প্লাবিত করে দিলুম। উঃ, বলবো কী ঠোঁট দুটি আমার কিছুতেই ক্লান্ত হয় না তার নরম ঠোঁটের ঘর্ষণ পেয়ে। রিভেট খুড়ো মশায়ের সংগে তর্ক করতে করতে আমাদের আগে আগে চলেছে।

বাড়ি ফিরে টেলিগ্রাম পাওয়া গেল—হেন্‌রিয়েটার খুড়িমা পরদিন সকাল সাতটায় এসে পৌঁছোবেন।

খুড়ো মশাই ভাইঝিকে সম্বোধন করে বললেন: আচ্ছা হেন্‌রিয়েটা ভদ্রলোকদের ঘর দেখিয়ে দাও গে।—

প্রথমেই রিভেটকে পৌঁছতে গেল। সে তাতে ফিস্‌-ফিস করে আমায় বললে: তোমায় আগে পৌঁছে দিলেই ভালো করতো শ্রীমতি। আমার কাছে তো আর ভয়ের কিছু ছিলো না!...

এইবার হেন্‌রিয়েটা আমাকে পৌঁছে দিলো আমার জন্যে নির্দ্দিষ্ট ঘরটিতে। ঘরে পৌঁছনো গেল, আশেপাশে কেউ নেই; আবার আমরা লোকচক্ষুর আড়ালে হাজির হয়েছি দেখে ব্যগ্র বাহু দিয়ে জড়িয়ে টেনে নিলুম বুকের

কাছে। নানা ভাবে তাকে উত্তেজিত করে সব বাধা কাটিয়ে নিয়ে একেবারে জয় করে এনেছি, হঠাৎ বিপদ বুঝতে পেরে কোনো রকমে আত্মরক্ষা করে সে একেবারে ছুটে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। আমি বিছানায় পড়ে পড়ে হাত কামড়াতে লাগলুম—ইস্, কী ভুলই হয়ে গেল। বোকার মতো ওকে ছেড়ে দিলুম কী করে? জানি তো রাত্তিরে ঘুমের দফা রফা, তবু ওকে যেতে দিয়েছি!

এমনি ধারা অনুশোচনায় যখন ব্যস্ত, দরজায় মৃদু টোকা শোনা গেল। আমার প্রশ্নের জবাব এলো অতি ধীরে: আমি।

ত্বরিতে গাউনটা জড়িয়ে নিয়ে দোর খুলে দিলুম। ঘরে এসে দাঁড়ালো সে: জিজ্ঞেস করতে ভুল হয়ে গেছে। সকালে কি খাবেন—চা, চকোলেট না কফি?—

অধীর ভাবে তাকে জড়িয়ে নিয়ে গোগ্রাসে চুমু খেতে খেতে বললুম: আমি খাবো, আমি খাবো—

কিন্তু হাত থেকে আমার মুক্ত হয়ে এক ফুঁয়ে বাতিটা নিভিয়ে দিয়ে আবার সে পালিয়ে গেল! সেই অন্ধকারে পাগলের মতো একটা দেশলায়ের খোঁজ করতে লাগলুম। বহু চেষ্টায় দেশলাই বের করে আলোটা জ্বেলে বারান্দায় হাজির হলুম—তখন আমি প্রায় পাগল হয়ে উঠেছি!

কী করতে চলেছি সে বিচার করবার অবকাশ ছিলো

না, ওকে আমার চাই, খুঁজে পেতেই হবে। কয়েক পা এগিয়েও গেছি সহসা মনে হোলো, তাইতো, এ আমি করছি কী? যদি খুড়ো মশায়ের ঘরে গিয়ে পৌঁছুই, তাহলে! তাহলে কী বলবো?

স্পন্দিত বুকে স্থাণুর মতো দাঁড়িয়ে থাকার পর সে কথার জবাব এসে যায় মাথায়ঃ নিশ্চয়ই আমি বলতে পারি রিভেটের সংগে একটা জরুরী পরামর্শ আছে তাই তার ঘর খুঁজছি।— সুতরাং এক এক করে প্রতিটি দরজা খুঁজতে খুঁজতে একসময় একটা দরজার হাতল ঘুরিয়ে একেবারে ভেতরে ঢুকে পড়লুম। বিছানায় হেন্‌রিয়েটা বসে আছে। চোখদুটি আমার ওপরেই ন্যস্ত কিন্তু কূলে কূলে জল ভরে রয়েছে।

আস্তে দরজাটা বন্ধ করে ডিঙি মেরে তার কাছে হাজির হয়ে বললুম, মাদ্‌মোজেল, একটা পড়বার বই চাইতে ভুলে গিয়েছিলুম।—

কি বই যে সেদিন আমি পড়েছিলুম তা তোমাকে বলবো না, তবে সেই বইখানা অদ্ভুত রোম্যান্সে ভরা ছিলো। যতক্ষণ না বাতিটা পুড়ে শেষ হয়েছিলো ততক্ষণ সেখানে আমি বইখানা পড়লুম। তারপর তাকে ধন্যবাদ জানিয়ে চুপিসাড়ে বেরিয়ে এলুম ঘর থেকে। হঠাৎ কর্কশ হাতে কে যেন চেপে ধরলো আমাকে। কণ্ঠ শুনে বুঝতে পারলুম সে আর কেউ নয়, রিভেট!

রিভেট চুপি চুপি বললো : মোরিনের ব্যাপারটার মীমাংসা এখনো করতে পারোনি দেখছি!—

সকাল সাতটা বাজলো ঘড়িতে। এক কাপ চকোলেট নিজের হাতে নিয়ে হাজির হোলো আমার পাশে। বলবো কি ভাই অমন সুগন্ধি পানীয় আজ পর্যন্ত আর খাওয়ার সুযোগ হয়নি! কিছুতেই কাপটাকে মুখ থেকে নামাতে পারছিলুম না। সে আমার ঘর থেকে বিদায় নিয়েছে কিনা রিভেট এসে ঢুকলো। সারা রাত জেগে থাকলে যেমন খিট্‌খিটে হয় সেই ভাবের মনে হোলো তাকে। বেশ ঝাঁঝালো স্বরে বললে : এভাবে কাণ্ডকারখানা চালিয়ে গেলে সেই গাড়ল মোরিনের ব্যাপারটা একেবারে ভেস্তে যাবে, তা বলে দিচ্ছি!...

ঠিক আটটার সময় খুড়িমা এসে হাজির হলেন, তাঁর সংগে আমাদের কথাবার্তা বেশিক্ষণ হোলো না, তাঁরা মামলা তুলে নিলেন। ওঁদের শহরের দুঃস্থদের জন্যে পাঁচশো ফ্রাঁ চাঁদা দিলুম। তাঁরা আমাদের ছেড়ে দিতে চান না কিছুতেই, বিকেলবেলায় ওখানকার ধ্বংসাবশেষ দেখতে যাবার ব্যবস্থা পর্যন্ত করে ফেললেন। হেন্‌রিয়েটা তার কাকার পেছনদিক থেকে ইশারায় আমায় থাকবার জন্যে অনুনয় করতে লাগলো, আমিও রাজী হ'য়ে পড়লুম। বাদ সাধলো রিভেট, সে একেবারে এককাট্টা হোলো চলে আসবার জন্যে।

আমি তাকে জনান্তিকে টেনে এনে অনেক বোঝালাম, করলাম অনুনয়বিনয় এবং মিনতি। কিন্তু সে কেবলি বলতে থাকে: ঢের হয়েছে গাড়লটার ব্যাপারের মধ্যস্থতা! আর আমার দ্বারা কিছু হবে না, বুঝতে পারছো!...

চলে আসতে আমাকে হোলোই। সে হোলো অন্যতম চরম মুহূর্ত আমার জীবনের। ব্যবস্থাটা পাকা করেই ফেলতে পারতাম নিঃসন্দেহে ··যাই হোক, রেলের কামরায় নীরবে উঠে বসলুম। নিঃশব্দে হেন্‌রিয়েটার করমর্দন করে রিভেটকে বললুম: তুমি একটি আস্ত জানোয়ার!...

উত্তরে রিভেট বললে: বন্ধু হে, তুমি আমায় যা-তা কাণ্ড করে উত্তেজিত করতে শুরু করেছিলে!—

আলো-অফিসের সামনে আসতেই দেখলুম ছোটোখাটো এক জনতা আমাদের প্রতীক্ষারত। আমাদের দেখতে পেয়ে চীৎকার করে জানতে চাইলো: গাড়ল মোরিনের ব্যাপারটা মিটমাট হয়েছে তো?

লা রোচেলির অধিবাসী সবাই মোরিনের ব্যাপারে বিশেষ আগ্রহশীল দেখলাম। ইতিমধ্যে রিভেটের অপ্রসন্নতা দূর হয়ে গিয়েছিলো, সে বহু কষ্টে হাসি সংবরণ করে বললে: হ্যাঁ, তা পারা গেছে। লাবারে-কে ধন্যবাদ।

তারপর আমরা চললাম মোরিনের বাড়ি। একটা ইজি চেয়ারে আধমরা অবস্থায় বসে আছে লোকটা,

কপালে জলপটি, পায়ে সরষের প্ল্যাষ্টার ; খুক্‌খুকিয়ে কাশছে। অদ্ভুত ধরনের কাশি, মৃত্যু পথযাত্রীরা যেমন কেশে থাকে। মোরিনের সামনে বাঘিনীর মতো থাবা পেতে বসে তার স্ত্রী, কেবল লোকটাকে খাওয়াই বাকী। আমাদের ঘরে ঢুকতে দেখেই ওর হাত পা এমন ঠক্‌ঠক্ করে কাঁপতে লাগলো যে আমি তাড়াতাড়ি বলে উঠলাম, বুঝলে হতভাগা, সব ঝঞ্ঝাট মিটিয়ে এসেছি। কিন্তু খবরদার ভবিষ্যতে যেন এমন আর না হয়।

ও যে কী করবে ভেবে পায় না যেন, একবার আমার হাতে চুমু খায়, একবার রিভেটকে জড়িয়ে ধরে, চীৎকার করে ওঠে, অজ্ঞান হবার মতো হয় আবার পরমুহূর্তে সেই বাঘিনীকে চুমু খেয়ে বসে। ব্যস, আর যায় কোথা, দজ্জালিনী তাকে এমন এক ধাক্কা দেয় যে ঘুরপাক খেয়ে আবার চেয়ারে বসে পড়ে।

সে ধাক্কা কাটিয়ে উঠতে পারলো না মোরিন কিছুতেই ; মন তার বড্ডই ভেঙে পড়লো। সারা শহরে নাম বেরিয়ে গেল ওই গাড়ল শূয়োর মোরিন। এ বিশেষণ যখনই ব্যবহৃত হোতো মর্মে গিয়ে যেন তরোয়ালের খোঁচা, বসিয়ে দিতো। এমন কি রাস্তার কোনো ছোঁড়া যদি 'শূয়োরটা' বলে চেঁচিয়ে উঠতো ও অভ্যাসবশেই তার দিকে তাকিয়ে থাকতো। বন্ধুবান্ধবেরা মর্মান্তিক রসিকতা করতে ছাড়তো না। হয়তো খানা খেতে বসেছে সবাই

মিলে, শূয়োরের মাংস খেয়ে বলে উঠতো : বাঃ, তোমার মাংসই তো খাওয়া গেল!

এইভাবে ঘরে বাইরে জ্বালা ভোগ করে মোরিন বছর দুই পরে দেহ রাখলো।

আমার কথা জানতে চাইছো? ১৮৭? সালে আমি যখন ডেপুটি-গিরির উমেদারী করছি, ফসারেত্তে নতুন নোটারীর সংগে দেখা করার জন্যে গেছি। ভদ্রলোকের নাম মঁসিয়ে বেলংক্র, তাঁর ভোট আমার প্রয়োজন। একটি বিত্তশালিনী ভদ্রমহিলা আমায় অভ্যর্থনা জানালেন। বললেন: বোধহয় চিনতে পারছেন না আমাকে। তাই নয়?

আমি ইতস্তত করি—তাইতো, না, ঠিক তা নয় তবে—

—হেন্‌রিয়েটা বোনেল।

—ওহো, তাই নাকী?

কিন্তু পরমুহূর্তে বিবর্ণ হয়ে উঠি কিন্তু হেন্‌রিয়েটা বেশ সপ্রতিভ ভাবে তাকিয়ে মৃদু মৃদু হাসতে থাকে।

কিছুক্ষণ পরে হেন্‌রিয়েটা উঠে যায় সেখান থেকে। তখন তার স্বামী আমার হাতদুটি মুঠোয় পুরে নিয়ে নিষ্পেষণ করে বলতে থাকেন: আপনার সংগে দেখা করার ইচ্ছে আমার বহু দিনকার কিন্তু কিছুতেই আর সময় করে উঠতে পারছিলাম না। আমার স্ত্রী তো প্রায়ই আপনার কথা বলেন। খুব সংকটের সময় আপনি

ওর সংগে আলাপ করেছিলেন। আপনার আচরণও কতো সুন্দর ছিলো। কী অদ্ভুত ভাবে কায়দা করে আপনি সেই গাড়লটার—কি নাম যেন, হ্যা, সেই ছুঁচো মোরিনটার ব্যাপার মিটমাট করে দিয়েছিলেন। সে জন্যে আমি খুব কৃতজ্ঞ :—

সবিশেষণ মোরিনের নাম উচ্চারণের সময় বিজাতীয় ঘৃণা প্রকাশ পেল ভদ্রলোকটির কণ্ঠে। এখনো সেই ধিক্কার আমি স্পষ্ট শুনতে পাই।

নাইটিংগেল

বেশি দিনের কথা নয়……

রোমানা শহরে ছিলেন একজন চৌকশ নাইট। নাম জানতে চাইছেন? নাম তাঁর লিজিয়ো দা ভালবোনা। সংসারের বন্ধন বলতে মাত্র দুটি—স্ত্রী আর মেয়ে। মাদাম গিয়াকোমিনার গর্ভজাত কন্যা ক্যাটারিনার রূপের খ্যাতি ছিলো অসাধারণ। আশপাশের পাঁচ-দশখানা গ্রামের লোক একবাক্যে স্বীকার করতো তাকে সুন্দরীশ্রেষ্ঠা। দশটা না, পাঁচটা না, শিবরাত্তিরের সলতে বলতে ওই ক্যাটারিনা, বাপ-মা'র সে কী যত্ন-আত্তি। পান থেকে চুনটি খসবার উপায় নেই। পাড়ার পাঁচজনের সংগে ঘনিষ্ঠতা বাড়িয়ে তুলবে তাঁদের চোখের মণি ক্যাটারিনা—এমন একটা অভি-লাষ নাইট-দম্পতির মনের আনাচে-কানাচে উঁকি দিয়ে যায়; তাঁরা যা পারেন নি, মেয়েকে দিয়ে সেই ত্রুটি সেরে নেবার তাই বাসনা।

এঁদের বাড়িতে একটি সুদর্শন যুবককে প্রায়ই আসা-যাওয়া ক'রতে দেখা যায়—সে রিসিয়ার্ডো। কর্তা-গিন্নী এই ছোক্‌রাটিকে ভারি পছন্দ করেন, তাঁদের বিশ্বাসও এর ওপর অগাধ। রিসিয়ার্ডো যেন তাঁদের নিজের ছেলে, ওর তরফ থেকে কোনোরকম বিচ্যুতির সম্ভাবনা নেই একেবারেই।

রিসিয়ার্ডো এ বাড়িতে আসে, বুড়োবুড়ির সংগে কথা-বার্তা ক'য়েই ফিরে যায় স্বস্থানে, দূর থেকে শুধু ছাখে রূপসী ক্যাটারিনার চোখ-ধাঁধানো রূপ। কথা বলার সাহস নেই, মুগ্ধ ভক্ত মনে মনেই করে প্রেম-নিবেদন। ক্যাটারিনার নজর এড়ায় না, নীরবে লক্ষ্য করে রিসিয়ার্ডোর আচরণ। কিন্তু এই চোখের দেখার ফাঁকে কখন যে মনের কোণে আসন পাতা হ'য়ে গেছে, বুঝতে পারেনি সেটা ক্যাটারিনা। নিজের অজান্তেই সে বারতা ফুটে ওঠে তার মুখে চোখে; লুব্ধ দৃষ্টিতে রিসিয়ার্ডো তা ছাখে। একদিন সুযোগও মিলে যায়, বহু কষ্টে সাহস সঞ্চয় ক'রে সে আবেগভরে ব'লে ওঠে: দোহাই ক্যাটারিনা, আমায় বাঁচাও। আমি তোমায় ভালোবাসি।

ক্যাটারিনা সংগে সংগে বলে: ভগবান করুন, তোমার এই করুণা যেন চিরদিন বজায় থাকে।

আশাতীত প্রতিদান পেয়ে রিসিয়ার্ডো খুশিতে নেচে ওঠে: তোমার আনন্দ যাতে অফুরন্ত হয়, কামনা বাসনা যাতে সার্থক হ'তে পারে—সে দিকে দৃষ্টি থাকবে আমার সব সময়; কিন্তু উপস্থিত একটা কিছু উপায় বের ক'রতে পারবে রাণি—আমরা যাতে কিছুটা সুখী হ'তে পারি?

—তুমি তো দেখছো রিসিয়ার্ডো, আমায় কেমনধারা চোখে চোখে রেখেছেন এঁরা। তোমাকে কাছে পাবার কোনো উপায় ঠিক করা আমার দ্বারা সম্ভব নয়। বরং

আমার লজ্জা-সরম বাঁচিয়ে যদি কোনো উপায় ঠাওরাতে পারো তো বলো, আমি ভারি খুশি হবো।

প্রেমিক পুরুষ চিন্তা ক'রতে থাকে—আকাশ-পাতাল ভাবনা! তার না আছে শেষ, না আছে ধারাবাহিকতা! অবিশ্যি বিক্ষিপ্ত চিন্তা থেকেই মিললো পথের সন্ধান। খুশি-ভরা স্বরে রিসিয়ার্ডো বললে: মরমিয়া ক্যাটারিনা, ভেবে দেখলুম অনেক রকমই, কিন্তু কোনোটাই আমাদের পক্ষে সুবিধের নয়। একটা জিনিস হ'তে পারে—তুমি যদি বাগানের পাশে তোমাদের ছাতের ওই পাটাতনের ওপর রাত্তিরে ঘুমোবার ব্যবস্থা ক'রতে পারো। খবরটা যেমন ক'রে হোক আমি যেন পাই, তাহ'লে দেখবে তোমার বুকের পাশটিতে আমি হাজির হ'য়ে গেছি ঠিক সময়েই। কী বললে, মাটি থেকে ও জায়গাটা অনেক উঁচুতে?—তা হোক, যতো উঁচু হোক আমায় রুখতে পারে এমন মানুষ, এমন বাধা, প্রতিবন্ধক তুনিয়ায় কোথাও নেই।

ক্যাটারিনা শুধু বলে: ওখানে আসতে তোমার যদি না আটকায় তাহ'লে আমারও এ ব্যবস্থা ক'রতে বিশেষ অসুবিধে হবে না।

রিসিয়ার্ডো কথামতো কাজ ক'রতে প্রতিজ্ঞা করে; তখনকার মতো ছাড়াছাড়ি হয় তুটি সদ্য প্রেমিক-প্রেমিকার।

পরের দিন।

মে মাসের শেষ, চারিদিকে গরমের যথেষ্ট সূচনা দেখা

দিয়েছে। ক্যাটারিনা থম্‌থমে মুখে মায়ের কাছে এসে হাজির। মেয়ের ভাবান্তর লক্ষ্য ক'রে মা কারণ জিজ্ঞেস করেন। অনুযোগভরে ক্যাটারিনা বলেঃ কাল রাতে একটুয়ো যদি ছু চোখের পাতা এক ক'রে থাকি।

'সে কী রে?'—মা'র চোখে বিস্ময়ের চিহ্ন!

—আহা, জানো না যেন! কী ভীষণ গরম পড়েছিলো কাল! বাবাঃ, এমনধারা ছুদিন যদি না ঘুমোতে পাই, তা'হলে হ'য়েছে আর কী!

—কী যে বলিস বাপু তোরা! গরমের কোথায় কি! এখনো তো বেশ ঠাণ্ডা রয়েচে।......

মায়ের স্নেহডোর থেকে নিজেকে মুক্ত ক'রে নিতে নিতে ক্যাটারিনা বললেঃ তোমরা সব বুড়ো-হাবড়ার দল, গরমের জ্বালা এ বয়েসে বুঝবে কি ক'রে বলো? আমাদের সংগে ওইখানেই তো তফাৎ।

অসহায়ের মতো মা তখন জানতে চান মেয়ের কি অভিরুচি। তাঁর পক্ষে তো আর এটা সম্ভব নয় যে, গরম আবহাওয়াকে ঠাণ্ডায় পরিবর্তিত ক'রে দেন।— ভালো জ্বালা হোলো যা হোক, কী খামখেয়ালি মেয়ে রে বাবা!

শুনতে পান মেয়ের কথাঃ ঠাণ্ডা আর পড়বে না মা, যতো দিন যাবে ততোই গরম বাড়বে।

আদরে নুয়ে পড়ে মেয়ে মায়ের গলা জড়িয়ে ধরে। চুপি চুপি বলে, লক্ষ্মীটি মা, বলো অমত করবে না?—

—তার মানে ?

—মানে বেশি কিছু নয় গো, বেশি কিছু নয়। শুধু একটু অনুমতি চাই।

—অনুমতি ? মেয়ের মতলবটা এবার জানতে চান নাইট-গৃহিণী।

—জানো মা, আমি ঠিক ক'রেছি যদ্দিন এই রকম গরম আবহাওয়া থাকবে, ততদিন আমি ছাতের ওই পাটাতনের ওপর শোবো। আহা, ওখানটায় কী সুন্দর ফুরফুরে হাওয়া বয়, আর কী চমৎকার নাইটিংগেলের গান শোনা যায়। তাই না মা ? যাই বলো বাপু, ঘরের গুমোটের মধ্যে শোয়ার চেয়ে ও জায়গা অনেক ভালো।

মায়ের মন ভিজোবার জন্যে ক্যাটারিনা তাঁর গলাটা জড়িয়ে ধরে আদর ক'রতে থাকে।

মা আস্তে আস্তে বলেন : বেশ, আমি ওনাকে আজই বলবো। উনি যদি রাজী হন, তা'হলে আর ভাবনা কী ?

কর্তা কিন্তু সেকথা গ্রাহ্যে আনেন না। একে সাবেক কালের লোক, তার ওপর বয়েস হ'য়েছে, রাজী হন কি ক'রে ? সব শুনে জবাব দেন : কোন্ নাইটিংগেলের কথা বল্‌ছে তোমার মেয়ে ? আর নাইটিংগেল কেন, ঝিঁঝির গান শোনাবার ব্যবস্থা ক'রে দেবো তোমার মেয়েকে, ভাবনা কিসের।

কথাটা ক্যাটারিনার কানে গেল। সে-রাত সে ঠায়

জেগে রইলো। চোখে পাতায় এক ক'রলো না একটি মুহূর্তও! সে নিজে তো ঘুমোলোই না, মাকেও দিলো না একটু স্থির হ'য়ে শুতে।

ভোর হ'তে না হ'তেই মা ছুটলেন কর্তার ঘরে। মেয়েটা যে গরমের জন্যে সত্যিই ঘুমোতে পারছে না, সে কথা জানিয়ে তিনি ভীষণ অনুযোগ করেন। সে যদি ছাতে শোয়, তাতে কী এমন মহাভারত অশুদ্ধ হয়, তা তো তিনি বুঝতে পারেন না।—দশটা না, পাঁচটা না, ওই একটি মাত্তর মেয়ে তাঁদের, তার প্রতি এমন মনোভাব মোটেই উচিত নয়।

এইবার নাইট মহোদয়ের মন ভেজে। অগত্যা তিনি বললেন : বেশ, তাই হোক। ক'রে দাও ওখানে ওর জন্যে শোবার ব্যবস্থা। তোমার ইচ্ছে হ'য়েছে যখন, শুনুক নাইটিংগেলের গান।

ছাতের পাটাতনের ওপর বিছানার বন্দোবস্ত হ'য়ে যায়। ক্যাটারিনা খুশি মনে সব ছাখে। শেষে তার মনের মানুষটিকে আকারে-ইংগিতে সময় থাকতে জানিয়ে দিতে ভোলে না। রিসিয়ার্ডো সংগে সংগে তার কর্তব্যকর্ম ঠিক ক'রে ফ্যালে, একটুয়ো দেরি করেনা।

রাত্তিরে মেয়েকে শুতে পাঠিয়ে দিয়ে নাইট মশাই নিজের হাতে সেখানকার দরজা বন্ধ ক'রে দেন। তারপর সোজা গিয়ে শুয়ে পড়েন বিছানায়।

ঘড়ির কাঁটা এগিয়ে চলে, দেখতে দেখতে আশপাশ চারিধার নিঝুম হ'য়ে আসে। কেউ কোথাও জেগে নেই শুধু 'পথ চেয়ে আর কাল গুণে' একটি তৃষিত হৃদয় জাগর-আঁখি মেলে পড়ে আছে—হঠাৎ কিসের মৃত্যু শব্দে উন্মুখ হয়ে বাইরের দিকে চায়। আঃ, একটা অনাবিল শান্তি ছোঁয়া দিয়ে যায় ক্যাটারিনার ব্যাকুল মনে, বেপথু দেহে! ওই তো—ওই তো সেই···হ্যাঁ, এসে গেছে সে।

রিসিয়ার্ডো পর মূহুর্তে পাঁচিলের ওপাশ দিয়ে মৃদুচরণে লাফিয়ে পড়লো দয়িতার বুকের কাছটিতে। এতো বিপদ-সংকুল পথ পেরিয়ে আসতে পা তার একটুয়ো কাঁপেনি, বুকে দোলা লাগেনি বিন্দুমাত্র। সে যে ভরপুর হ'য়ে আছে মনোরমা ক্যাটারিনার ধ্যানে।

এই প্রথম দুজনে পেল দুজনকে একান্তে, একেবারে হৃদয়ের পাশটিতে। পথ চেয়ে থাকার বেদনা মুহূর্তে অপগত হয়, ভরে ওঠে পরিবেশ সুধারসে। সেই আনন্দ-বাসর নাইটিংগেলের মধুর গানে আরো মধুর হয়, ছোট্ট পাখি ভোলে না তার মন-মাতানো গানের পরশ দিতে।

সময় কতোই না ছোটো—বিশেষ ক'রে সুখের মুহূর্ত... জল্পনা-কল্পনা আদান প্রদানের মাঝ দিয়ে বহু সময় ব্যয়িত হ'য়ে যায়। নেমে আসে সুখ-শ্রান্তি···কোন্ অজ্ঞাত মুহূর্তে দুজনে ধরা দিতে বাধ্য হয় ঘুমের হাতে।·····

দিনের আলো ফুটে উঠতে থাকে, ভোরের ঠাণ্ডা বাতাসে

নাইট মশাই জেগে ওঠেন, খেয়াল হয় তাঁর মেয়ের কথা। 'দেখি নাইটিংগেলের গানে ক্যাটারিনা কেমন ঘুমোচ্ছে'—মনে মনে বলেন তিনি, এগিয়ে চলেন ছাতের দিকে।

পাটাতনের কাছে হাজির হয়ে আস্তে আস্তে পর্দাটা ধরলেন, পাছে মেয়ের ঘুম ভেঙে যায়, তাই নিঃশব্দে একটুখানি তুলে ধরেন···কিন্তু পর্দাটা বারেকের জন্যে তুলে ধরেই বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মতো ছেড়ে দিতে বাধ্য হন। কী দেখলেন তিনি? চোখে কি এখনো ঘুমের ঘোর লেগে আছে নাকি?

বৃদ্ধ বিহ্বলের মতো আবার পর্দাটা তুললেন, তারপর একরকম দৌড়ে গিয়ে স্ত্রীকে ধাক্কা দিয়ে তুলে দেন। বলেন: শীগ্‌গির দেখবে চলো, তোমার মেয়ে কেমন নাইটিংগেলের গান শুনে ঘুমোচ্ছে। ওঠো, ওঠো।

নাইট-গিন্নী ধড়মড় ক'রে উঠে বসেন। কোনোরকমে কাপড়-চোপড়টা সামলে নিয়ে হাজির হন ছাতে। কাণ্ড দেখে মাথা তাঁর ঘুরে যায়। ওরা দু'জনে তখনো সুখ-স্বপ্নে বিভোর—মুখে লেগে রয়েছে ক্ষীণ হাসির রেশ, দুজনের হাত পরস্পর সন্নিবদ্ধ।

চীৎকার ক'রে কি বলতে যাচ্ছিলেন ভদ্রমহিলা, নাইট ভদ্রলোক এক কথায় থামিয়ে দেন। চুপি চুপি বলেন: খবরদার, একটি কথাও নয়। টুঁ শব্দটি কোরো না। ওরা যতক্ষণ পারে ঘুমোক। আমি ওকে কিছু বলবো না,

শুধু ওদের আজকের এই ব্যাপার যাতে চিরস্থায়ী হয়, তার ব্যবস্থা করবো। জানো তো, ও ছোক্‌রা ভালো ঘরের ছেলে, পয়সা-কড়িও যথেষ্ট আছে; কাজেই ওর সংগে যদি···বুঝলে তো?

মায়ের চিন্তিত মুখে প্রশান্তির ছাপ পড়ে—নিদারুণ দুশ্চিন্তার মেঘ চিরে আশার আলো ঝিলিক দেয়। লক্ষ্য করেন মেয়ের ঘুমন্ত মুখখানি, সত্যিই সে গাঢ় ঘুমে আচ্ছন্ন হ'য়ে আছে। আহা, ঘুমোক, নাইটিংগেলকে এমনি ক'রেই যেন ধরতে পারে আঁচল দিয়ে।—

ওদিকে হঠাৎ রিসিয়ার্ডোর স্বপ্ন ভেঙে যেতে দেরি হয় না। চোখ চেয়েই তার চক্ষুস্থির; কট্‌কটে আলোয় চারিদিক ভরে গেছে যে! তাড়াতাড়ি ক্যাটারিনার গায়ে ধাক্কা দিতে দিতে ভগ্নস্বরে বলে: হায় হায়, কী করি এখন? বেলা যে অনেক হয়ে গেছে!

তার কথা শেষ হবার সংগে সংগেই পেছন থেকে নাইট-মশায়ের গলা শোনা যায়: সব ব্যবস্থাই করবো আমরা, চিন্তা কোরো না।—

অ্যাঁ!—সে কী? তাহ'লে—

দু'বার ব্যর্থ চেষ্টার পর রিসিয়ার্ডো উঠে বসে বিছানায়। পাংশুমুখে ক্যাটারিনার বাবার মুখের দিকে চেয়ে জোড় হাতে কাঁপতে কাঁপতে বলে: ভগবানের দোহাই, আমায় ক্ষমা করুন মহাশয়! স্বীকার করছি আমার অপরাধের একমাত্র

যোগ্য শাস্তি হোচ্ছে মৃত্যু—আপনার যা অভিরুচি সেই ব্যবস্থাই করুন। তবে, তবে যদি সম্ভব হয় প্রাণে মারবেন না, আমায় এটুকু ভিক্ষে দিন—

লিজিয়ো বলেন: ছাখো রিসিয়ার্ডো, তোমার সংগে আমার যে সম্পর্ক তাতে অতোটা গুরুশাস্তির কথাই উঠতে পারে না। কিন্তু এ-ব্যাপারটা এমনি বিশ্রী যে, এর থেকে উদ্ধার পাবার একটি পথই পড়ে আছে। আমার মান-সম্ভ্রম, তোমার জীবন দুই-ই এ-থেকে সুন্দরভাবে রক্ষে পেতে পারবে, ক্যাটারিনাকে যদি বিয়ে করো। তা'হলে সব দিক রক্ষে হয়, নইলে মৃত্যু ছাড়া গতি নেই ব'লেই মনে করি।—

বাবার কথা শুনে ক্যাটারিনা ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকে—কাঁদতে কাঁদতেই বার বার বলে রিসিয়ার্ডোকে মাফ করতে। রিসিয়ার্ডোকেও অনুরোধ জানাতে থাকে—সে যাতে লিজিয়োর কথায় রাজী হয়।—

কিন্তু বেশি কথার দরকার কোথায়? ক্যাটারিনার ভালোবাসা, সেই সংগে প্রাণের টান—এই দুয়ের টানা-টানিতে পড়ে রিসিয়ার্ডো সম্মতি জানিয়ে বসে। লিজিয়ো কালবিলম্ব না ক'রে স্ত্রীর আংটি নিয়ে ক্যাটা-রিনার সংগে তার বিয়ের ব্যবস্থা পাকা ক'রে ফেলেন। বিয়ে হয়ে যায়। তারপর এক সময় বিশ্রামের জন্যে তাদের একা থাকতে দিয়ে কর্তা-গিন্নী বিদায় নেন।

আরো কিছুদিন পর আনুষ্ঠানিক ভাবে বিয়ে হ'য়ে গেল

রিসিয়ার্ডোর সংগে ক্যাটারিনার। 'দীয়তাং ভুজ্যতাং-এর বান ডাকলো সাত পাড়ার লোকজনের মাঝে। সকলেই খুশি—নাইট-দম্পতিও সুখী হন।

ক্যাটারিনাকে নিয়ে রিসিয়ার্ডো ফিরে এলো নিজের ঘরে। শূন্য ঘর ভরে ওঠে কল-কূজনে, প্রেম-আলাপনে। আর ভাবনা কি আছে, নাইটিংগেল যে ধরা দিয়েছে মানস-প্রিয়ার কর-কোমলে !!

একটি প্রেমের অপমৃত্যু

সমাধি-ভূমি সামরিক অফিসারে ছেয়ে গেছে⋯বহু বিচিত্র সাজ-সজ্জা তাদের; লাল কোর্তা, বাঁকানো টুপি, সোনালি বোতাম, জামার কারুকার্য সব মিলিয়ে দূর থেকে মনে হয় ফুলের মেলা বসেছে যেন কোনো বাগানে। মৃতের মিছিল ইতস্তত বিস্তৃত, লৌহ মর্মর দারুময় স্মৃতি-ফলকগুলি বিষণ্ণ বাহু বিস্তার করে অবলুপ্ত মনুষ্য-সমাজের নীরব সাক্ষীরূপে বিরাজিত—তাদের অতিক্রম করে যায় একে একে ফরাসী, হাংগেরীয় উচ্চপদস্থ অশ্বারোহী ও পদাতিক বাহিনী।

কর্ণেল লিম্যসিনের স্ত্রীর অন্ত্যেষ্টি এইমাত্র সমাধা হোলো। স্নান করার সময় জলমগ্ন হ'য়েছিলেন ভদ্রমহিলা—সে আজ দু-দিনের কথা। তার পরবর্তী পর্বের যবনিকা পড়লো। ধর্মযাজক চলে গেলেন তাঁর করণীয় সেরে, পরপার-যাত্রিনীর যাত্রা যাতে নির্বিঘ্ন হয় তার জন্যে করলেন গুরুগম্ভীরে মন্ত্রোচ্চারণ। তিনি চলে গেলেও কর্ণেল অপেক্ষা করতে লাগলেন, সংগে রইলেন দুটি সহকর্মী সামরিক অফিসার। ওইযে সদ্য-প্রোথিত ওক কাঠের কফিন এখনো দৃষ্টির আড়ালে আত্ম-গোপন করতে পারেনি, ওরি অভ্যন্তরে

রয়েছে তাঁর নয়নের মণি তরুণী ভার্যা! চোখে প্রতিভাত হয় প্রিয়ার মুখচ্ছবি; সবি অবিকল রয়েছে, কেবল বিকৃত হ'য়ে উঠেছে অস্বাভাবিক মৃত্যুর নির্মম বিধানে। বরণীয় অংগ-প্রত্যংগ বিগলিত, পূতিগন্ধময়। বিয়োগবিধুর কর্ণেল বাষ্পাচ্ছন্ন চোখে ভূগর্ভের দিকে তাকিয়ে রয়েছেন।

লম্বা, পাত্‌লা গড়নের এই মানুষটি বার্ধক্যের দ্বারে উপস্থিত হ'য়েছেন বলা চলে। দীর্ঘ পাকা গোঁফে মুখখানা বেশ ভরাট হয়ে আছে। তিন বছর আগে সহকর্মী ও বন্ধু কর্ণেল সর্টিস সহসা মারা গেলে তাঁর একমাত্র মেয়ে অনাথা হ'য়ে পড়ে। লিম্যসিন মেয়েটিকে বিপদ থেকে উদ্ধার করলেন, করলেন সহধর্মিণী যথাযোগ্য সম্মানের সংগে।

ক্যাপ্টেন ও লেফ্‌টেন্যাণ্টকে অবলম্বন ক'রে দাঁড়িয়েছিলেন তাঁদের উর্দ্ধতন কর্মচারী; তাঁরা ভদ্রলোককে স্থানান্তরে নেবার সাধ্যমত চেষ্টাও করছিলেন। ইনি স্থাণুর মতো দাঁড়িয়ে প্রাণপণে অশ্রু-প্রবাহ রোধ ক'রে অস্ফুট স্বরে বলতে থাকেন: না না, আর একটুখানি—একটু শুধু!—

সেই সর্বনাশা গহ্বরের সামনে থেকে কিছুতেই তিনি সরতে চান না। ওই নাতিদীর্ঘ গর্ত অন্তহীন খাদ বলে মনে হয় তাঁর! ওরই মাঝে নিরুদ্দেশ হ'য়েছে জীবন-সর্বস্ব, যার অভাবে সব কিছুই শূন্য প্রতিভাত হ'চ্ছে, যার অদর্শনে বেঁচে থাকা নিরর্থক!

সহসা অরমণ্ট এগিয়ে এসে তাঁকে একরকম জোর করেই টেনে নিয়ে চললেন। বললেন: চলো বন্ধু বাড়ি যাই—কী হবে আর এখানে থেকে!...

এবারে আর দ্বিরুক্তি না করে শোকার্ত স্বামী ফিরে গেলেন তাঁর কোয়ার্টারে। ঘর-দোর তেমনি রয়েছে, নেই শুধু সেই হাস্যময় মুখখানি—আজ তিন বছর ধরে যার আলোয় কর্ণেলের শূন্য ঘর পূর্ণ হ'য়ে উঠেছিলো।

কর্ণেল তাড়াতাড়ি পাঠ-কক্ষে হাজির হ'লেন, কিন্তু দরজা খোলার সংগে সংগেই দৃষ্টি আকৃষ্ট হোলো একখানি চিঠির ওপর। টেবিলের একপাশে কোথা থেকে এলো এই পত্র এমন অসময়ে? বিস্মিত হয়ে তিনি চিঠিখানি কুড়িয়ে নিলেন। হস্তাক্ষর দেখেই নিদারুণ উত্তেজনায় সারা শরীর শিউরে ওঠে—এতো তাঁর স্ত্রীর হস্তাক্ষর। বিন্দুমাত্র অসুবিধা হয় না চিনতে। ডাকে এসেছে চিঠি, সেই দিনেরই শীলমোহর স্পষ্ট হ'য়ে ফুটে আছে খামের ওপর। কম্পিত হাতে ছিঁড়ে ফেললেন লেফাফা, রুদ্ধশ্বাসে পড়তে লাগলেন চিঠি:

বাবা! আগেকার দিনের মত আজও আমায় বাবা বলে ডাকতে দিন আপনি! এ চিঠি যখন আপনার হস্তগত হবে তখন আমি আর এই পৃথিবীর আলো দেখবার জন্যে উপস্থিত থাকবো না, আমার এ-দেহও মাটির বুকে ঠাঁই পাবে। মানুষের ধরা-ছোঁয়ার বাইরেই

যখন উপস্থিতি, আশাকরি সেক্ষেত্রে মার্জনা করতেও পারবেন। আপনার করুণা উদ্রেক করতে কিংবা আমার পাপ স্খালন করতে চাই না. আমি কোনো রকমেই, এক ঘণ্টার ভেতর এ জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটাবো স্বয়ং আমিই তাই রমণী-সুলভ বিশ্বস্ততা নিয়ে—মৃত্যু-পথযাত্রী নারীর ঐকান্তিকতা নিয়ে আমি এখানে সত্য ঘটনার সম্পূর্ণ বিবরণী জানাতে চাই—এইটুকুই আমার পরম কামনা।

করুণাভরে যেদিন আমায় স্ত্রীর সম্মান দিলেন, আমি বিনিময়ে আত্মদান করেছি কৃতজ্ঞতার সংগে, ভালোবেসেছি আপনাকে বালিকা-সুলভ মনোবৃত্তি নিয়ে। আমার বাবাকে যেমন ভালোবাসতুম তেমনধারা তো বটেই, মনে হয় তার চেয়েও বেশী ভালোবেসেছি। যখন আপনার কোলে বসে বসে আপনার চুম্বন লাভ করেছি সে সময় আপনাকে 'বাবা' বলে করেছি সম্বোধন। অবশ্য বহু চেষ্টা সত্ত্বেও এ সম্বোধন না করে পারিনি। এ ডাক স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে আমার অন্তর থেকে উচ্চারিত হ'য়েছিলো, আর সত্য কথা বলতে কি আপনি আমার কাছে পিতা ছাড়া অন্য কিছুই নন্। আপনিও তো হেসে আমায় বলেছিলেন, 'ওই নামেই আমায় ডেকো, আমার খুব ভালো লাগে!'

আমরা তো শহরে এলাম; এবং—ক্ষমা করুন বাবা —আমি ভালোবেসে ফেললাম! ওহো, কতো চেষ্টা করেছি, তা প্রায় দুবছর ধরে প্রাণপণে তাকে দূরে সরিয়ে দিতে

চেয়েছি, শেষে হার মেনেছি। পাপের পংকে নিমজ্জিত হ'লাম…হ'লাম আমি পতিত!

'তার' কথা জানতে চাইছেন? সে আপনি অনুমান পর্যন্ত করতে পারবেন না কে সে লোকটি। সব সময়েই আমায় ঘিরে থাকতো অন্ততঃ পক্ষে জনা বারো অফিসারে; সেইজন্যেই তো আপনি তাদের 'দ্বাদশ নক্ষত্রপুঞ্জ' আখ্যা দিয়েছিলেন, কাজেই আমি নিশ্চিন্ত আছি সেই লোকটির সম্বন্ধে। দোহাই বাবা, তার খোঁজ আপনি করবেন না, তাকে ঘৃণাও করবেন না। মানুষ মাত্রেই সে অবস্থায় ও-কাজ না করে পারত না। তাছাড়া সেতো প্রাণ দিয়ে আমায় ভালোবেসেছিলো এ আমি নিশ্চয় করে বলতে পারি।

এখন শুনুন, ওই যে ছোট্ট দ্বীপ 'বেকাসি' একেবারে কল-বাড়িটার লাগাও, সেখানে আমাদের মিলিত হবার বন্দোবস্ত হোলো একদিন। সাঁতার কেটে যেতে হোলো আমায় সেখানে, সেখানকার একটা ঝোপে সে অপেক্ষা করছিলো। শুধু তাই নয়, ওইখানে তাকে সন্ধ্যা পর্যন্ত লুকিয়ে থাকতে হবে তাহলেই কেউ তাকে ফিরে যেতে দেখতে পাবে না। তার দেখা পাওয়ার সংগে সংগেই তোমার আরদালি ফিলিপকেও দেখতে পেলুম। আমাদের অবাক করে দিতেই তার এই আবির্ভাব। সব গেল মনে করে আমি তো আর্তনাদ করে উঠলুম। এই অবস্থায়

সে বললে—সে মানে আমার প্রিয়তম—বললে : কথাটি না বলে চলে যাও সাঁতার দিয়ে প্রিয়া, আমি ওর সংগে বোঝাপড়া করছি।—

এমনই উত্তেজনা দেখা দিয়েছিলো যে আর একটু হ'লে ডুবেই যেতুম। অবশেষে বাড়ি ফিরে গেলুম, কিন্তু নিদারুণ উৎকণ্ঠা জেগে রইলো কী জানি একটা সাংঘাতিক কিছু ঘটবে।

ঘণ্টা খানেক পরে ড্রয়িংরুমের সামনের দালানে ফিলিপের সংগে দেখা হতেই সে খুব নীচু গলায় বললো : মেমসাহেবের যদি কোনো কাজ থাকে তো আমায় দিতে পারেন, আপনার হুকুম খাটতে আমি স্বীকার করেছি। দিন, যদি কোনো চিঠি দেবার থাকে।

পরে শুনলুম এ লোকটাকে আমার প্রিয়তম পয়সা দিয়ে কিনে ফেলেছে।—

যাই হোক, অনেকগুলো চিঠি তাকে দিলুম, সে নিয়ে গেল। ঠিক সময় সে সব চিঠির জবাব পেলুম তার হাত থেকেই। দু মাস ধরে এই উপায়ে চললো আমাদের পত্র আদান-প্রদান পর্ব। আপনি যেমন ওই লোকটাকে বিশ্বাস করেছিলেন তেমনিধারা ওর প্রতি নির্ভরতা গড়ে উঠেছিলো আমাদেরও মনে।

আচ্ছা, এবার শুনুন কি হোলো। আর একদিনের কথা বলছি, সেই দ্বীপে সাঁতার দিয়ে হাজির হ'য়ে দেখি

আকাঙ্খিত মানুষটির কোনো চিহ্নই নেই। বরং তার জায়গায় বসে আছে ওই আর্দালি! এদিকে আমি একা, নিরবচ্ছিন্ন একা। ওই লোকটা আমার জন্যে অপেক্ষা করছিলো, আমায় জানালো আমাদের কীর্তিকলাপ প্রতিটি বর্ণ জানিয়ে দেবে তোমায়, এমনিধারা সাত সতেরো ভয় দেখালো সে। এখন উপায়? সে কথায় ওই শয়তানটা বললো কী জানো? তার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করলে আমার কোনো চিন্তা থাকবে না।...

ওহো, বাবা! আতংকে দুশ্চিন্তায় চারদিক অন্ধকার দেখতে লাগলুম! সে যে কী কাপুরুষোচিত ভয়, একটা পথের কুকুরকে ভয় করা যেমন অসম্ভব হাস্যকর তেমনি ভয়ে শিউরে উঠলুম। তা' ছাড়া আপনি আমার প্রতি কতো দয়ালু আর আমি কী না আপনাকেই প্রতারিত করেছি! বিবেকের দংশনেও তো কম জ্বালা, কম ভয় নেই। এছাড়া ভয় হতে লাগলো আপনি জানতে পারলে ওই জানোয়ারটার টুঁটি ছিঁড়ে ফেলবেন সেই সংগে আমাকেও হয় তো!

আমার তখন পাগলের মতো অবস্থা—সে কথা বলে বোঝাতে পারবো না আপনাকে! চকিতে মনে পড়লো, কিনে নিতে হবে, শয়তানটাকে কিনে নিতে হবে! হ্যাঁ, আর একবার! কী লজ্জা, এ-ও যে আমায় ভালোবাসে, ওহো হো!...

কতোই না না দুর্বল আমরা! আমরা মেয়েরা আপনাদের

চেয়ে অতি সহজে বিচার-বুদ্ধি হারিয়ে ফেলি। আর অধঃ-পতন? তার কী শেষ আছে? একবার নীচে নামতে শুরু করলে মেয়েরা কিছুতেই থামতে পারে না, নীচ থেকে নীচে। নীচে একেবারে জাহান্নমের অতলে তলিয়ে যেতে বাধ্য হয়। কী যে তখন করছি সে খেয়াল ছিলো না আমার, কেবল এ-ই বুঝেছিলুম আপনাদের দু'জনের মধ্যে একজন আর আমি নিশ্চিত মারা পড়বো।···

আপনি নিশ্চয় লক্ষ্য করেছেন বাবা, কোনো রকম ওজুহাত দেখাইনি আমি এখন পর্যন্ত! আমার যা অনুমান করা উচিত ছিলো তাই-ই একে একে ঘটে যেতে থাকলো। যখনই তার প্রয়োজন হোতো আমাকে ভয় দেখিয়ে ইচ্ছামত আদায় করে নিতে কোনোদিন তাকে বিরত দেখা গেল না। সে-ও আমার প্রেমাস্পদ হ'য়ে উঠলো আমার সে-ই মনের মানুষটির মতো প্রতিদিনকার আচারে ব্যবহারে। এটা কী নিদারুণ ঘৃণ্য ব্যাপার? বলুন বাবা, কী মর্মান্তিক শাস্তি—এটা!

আর কী! আমার সব ফুরিয়ে গেছে, এবার আমি বিদায় নেবো এ পৃথিবী থেকে! বেঁচে থাকতে অপরাধ স্বীকার করবার ক্ষমতা ছিলো না, তাই তো আপনাকে জানাতে পারিনি বহু চেষ্টা করেও। এখন আমি জীবনের অপর পারে দাঁড়িয়ে বিনা দ্বিধায় প্রভূত সাহসে যে কোনো কাজই করতে পারি। মৃত্যু ছাড়া আমার গত্যন্তর নেই;

মরণই আমার সকল মালিন্য ধুয়ে মুছে দিতে পারবে। জানেন না আপনি, কতোদূর পংকিল হ'য়ে গেছি আমি। কাউকে ভালোবাসতে এখন আর পারি না, ভালোবাসা পাবার অধিকারও আমার নেই। আমার কলংকিত স্পর্শে সবকিছু অপবিত্র ক'রে ফেলেছি—শুধু মাত্র আমার অশুচি হাতের ছোঁয়া দিয়ে।

উপস্থিত স্নান করতে চললুম, এ যাওয়ার প্রত্যাবর্তন নেই জানবেন। কোনোদিন আর ফিরে আসবো না। আপনাকে লেখা এ চিঠি আমার প্রেমাস্পদের কাছে হাজির হবে আমি জানি, কিন্তু তখন আমি রক্তমাংসের এই শরীরে হাজির থাকবো না। কেউ ধারণাও করতে পারবে না চিঠিতে কি লেখা আছে। আমার অন্তিমঅনুরোধ রক্ষা করতে সে এখানা পাঠিয়ে দেবে আপনার কাছে। সমাধি-ভূমি থেকে ফিরে এসে পড়বেন আপনি।

এই পর্যন্ত। আর কিছু বলবার নেই বাবা। এবার বিদায় চাইছি। যা অভিরুচি হবে তা-ই করবেন কিন্তু সবার আগে দেবেন আমায় মার্জনা!....

বিন্দু বিন্দু ঘামে কপাল ভরে গেছে, আঙুল দিয়ে মুছে ফেললেন কর্ণেল সাহেব। স্থৈর্যের প্রতীক বলে মনে হয় তাঁকে—ধীর স্থির শান্ত। যুদ্ধক্ষেত্রে চরম বিপদের পরম মুহূর্তে এমন কতোদিন দেখা গেছে, আজ আবার সেই শান্ত

অভিব্যক্তি প্রকটিত। অকম্পিত হাতে টেলিফোন রিসিভার তুলে ধরলেন।...

পর মুহূর্তে ঢুকলো এসে একটি চাকর। গভীর চিন্তায় ডুবে গিয়েছিলেন ভদ্রলোক, পদশব্দে সম্বিত ফিরে পান: ফিলিপকে পাঠিয়ে দাও।

চাকর স্থানত্যাগ করে। হড়াৎ করে সশব্দে টেবিলের ড্রয়ার টানলেন কর্ণেল।

ফিলিপের হাজির হতে সামান্যও দেরি হয় না—বিরাট দেহ সৈনিক, লাল্‌চে গোঁফ, শয়তানের মত মুখ, চোখে ধূর্তমির ছায়া।

কর্ণেল পলকহীন দৃষ্টিতে তাকে লক্ষ্য করেন: আমার স্ত্রীর প্রেমিকের নাম বলতে রাজী আছো তুমি?

—কিন্তু,...আমি তো...

আচম্বিতে অর্ধোম্মুক্ত দেরাজের ভেতর থেকে পিস্তলটা টেনে নিলেন কর্ণেল: শিগগির বলো, নইলে দেখছো তো... আমি তামাসা করিনা জানো নিশ্চয়!

—আজ্ঞে, প্রভু, বলচি...বলচি...হ্যাঁ, তিনি হ'চ্ছেন ক্যাপ্টেন সেণ্ট অ্যালবার্ট...

সংগে সংগে পিস্তলের মুখে অগ্নিস্ফুলিংগ দেখা দিল; তখনো দুষ্কৃতকারীর নামোচ্চারণ সমাপ্ত হতে পারেনি, বিরাট দেহ কাণ্ডহীন কদলীবৃক্ষের মত কর্ণেলের পদপ্রান্তে লুটিয়ে পড়লো।